বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য

মোশাররফ হোসেন খান

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য

মোশাররফ হোসেন খান

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য

মোশাররফ হোসেন খান

কামিয়াব প্রকাশন ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশক
মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
কামিয়াব প্রকাশন, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ৭১১২২০৪, ০১৭১৫২৯২৬৬, ০১৭৩০৩১৯১৭
স্বত্ব
সংরক্ষিত
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৪
মূল্য
চল্লিশ টাকা মাত্র
(একদামে ক্রয় করুন)
প্রচ্ছদ
মাসুম বিল্লাহ
বর্ণবিন্যাস
কামিয়াব কম্পিউটার সেকশন
মুদ্রণ
পি এ প্রিন্টার্স
৪ আর এম দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

ISBN 985-8285-29-6
www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য নিয়ে খুব সামান্যই লেখালেখি হয়েছে। এই বিষয়ের ওপর বই প্রকাশিত হয়েছে তার চেয়েও কম। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, সেসব লেখা বা গ্রন্থ নিরপেক্ষ ও সম্পূর্ণ নয়। এর একটি অন্যতম কারণ, প্রতিটি লেখা বা গ্রন্থই হয়ে গেছে একপেশে। দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা এবং অনুদারতাই এর জন্য বেশি দায়ী।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেসব লেখায় বা গ্রন্থে কেবল তথাকথিত প্রগতিশীলদের অবদানই তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে আদর্শ বা ঐতিহ্যবাহী লেখকদেরকে।

এ ধরনের অস্বীকার করা বা সত্য ইতিহাসকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া সাহিত্যে অমার্জনীয় অপরাধ ও অসাধুতার পর্যায়বৃক্ত। মনে রাখা প্রয়োজন, একটি দেশের সামগ্রিক সাহিত্যে কেবল কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক অবদান থাকে না। এর পেছনে থাকে দেশের সকল স্তরের লেখকের শ্রমলব্ধ প্রচেষ্টা বা অবদান। সুতরাং কেবল আদর্শগত বা রাজনৈতিক কারণে কাউকে উপেক্ষা, অবজ্ঞা, কিংবা অস্বীকার করার প্রবণতা অত্যন্ত নির্লজ্জ এবং ঘৃণিত। বলাবাহুল্য, আমাদের দেশের সাহিত্য-বিচারটি এই দুষ্ট ক্ষতে ভীষণভাবে আক্রান্ত।

এই বেদনাবোধ থেকেই 'বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য' একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরার যৎসামান্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এখানে দল বা গোষ্ঠীকে অতিক্রম করে আমাদের শিশু সাহিত্যের সামগ্রিক প্রকৃত চিত্রটিকেই উন্মোচনের চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এই প্রয়াসটুকু কাজে আসলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

২০০২ ও ২০০৩ সালে 'কিশোর কণ্ঠ' সাহিত্য পুরস্কার ও সম্মেলন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকে দু'টি সুবিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেই দু'টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে প্রকাশিত হলো 'বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য'। দেশের ঐতিহ্যবাহী 'কামিয়াব প্রকাশন-এর' সম্পাদক ও প্রকাশক বন্ধুবর মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ও মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীনের আন্তরিকতা, আগ্রহ ও প্রেরণা এই গ্রন্থের পরতে পরতে যুক্ত হয়ে রইলো। সামান্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনেই কি সকল ঋণ পরিশোধ হয়? আল্লাহ তাঁদের এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে দিন।

মোশাররফ হোসেন খান
১৬, দক্ষিণ খিলগাঁও, ঢাকা।
৬ ডিসেম্বর, ২০০৪

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

রেখাভাষ

তর্ক-বিতর্ক থেমে নেই। কবে থেকে এই বিতর্কের সূত্রপাত, বলা কঠিন। তবে ধারাটি যে বহমান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গটি শিশু সাহিত্য। কাকে বলে শিশু সাহিত্য? কীইবা এর সংজ্ঞা? যেহেতু এ সাহিত্যের পাঠক শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সকল স্তরের, সম্ভবত এই কারণেই এতটা বাকবিতণ্ডা।

অনেকেই মনে করেন, শিশু সাহিত্য তাই, যা শিশুদেরকে সার্বিক আনন্দ বিধানের ব্যবস্থা করে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করে। এ দুইয়ের সমন্বয়ে যে সাহিত্য, তাই শিশু সাহিত্য। এ বিষয়ে একটি বিশ্বকোষের ভাষ্য হলো :

"In it's usually accepted sense, children's literature includes only that literature intended for the entertainment or instruction of children."

আর এনসাইক্লোপিডিয়া আমেরিকার অভিমত এই রকম ঃ

"In its wider and true sense, it emberses all literature marked by simplicity and vividness of expression and that piquantly imaginative quality demanded by young minds."

স্বীকার্য বটে, শিশু সাহিত্যের জন্য প্রকাশভঙ্গিটা হতে হবে সরল আর সুস্পষ্ট। বাঁকা-তেড়া বা কুটিলতার আশ্রয় নেয়া এখানে বেমানান। বস্তুত শিশু সাহিত্যের জন্য Wider and True Sense খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটাকে অনেকে আবার অপরিহার্য বিষয় বলেও মনে করেন।

শিশু সাহিত্যে শিক্ষার পরিধিটা কেমন বিস্তৃত হওয়া জরুরি, সেই ব্যাপক আলোচনার মধ্যে না গিয়েও আপাতত এতটুকু বলা প্রয়োজন যে, সেই সাহিত্যে তাদের আনন্দ ও মনোবিকাশের মাল-মশলা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে সততা, সাহস, ধৈর্য ও বিশ্বাসের মৌলিক উপকরণসমূহ।

বাস্তব বটে, শিশুরা বড়দের চেয়ে একটু বেশিই স্বপ্ন ও কল্পনাবিলাসী। আবেগের মাত্রাটাও তাদের মধ্যে প্রবল। এজন্য তারা কল্পনার পাখায় ভর করে ছুটে চলে আকাশরাজ্যে, চাঁদের দেশে। সখ্য গড়ে পরীদের সাথে। দেও-দানব হত্যা করে মুক্ত করে আনে রাজকন্যা বা রাজপুত্র। কখনওবা সমুদ্রের তলদেশে নামে, আবার পরক্ষণেই কোহকাফ পার হয়ে চলে যায় সীমাহীন সীমানায়। এক বাধাহীন কল্পনার ঘোড়ায় তারা সওয়ার হতে পারে, ভাসতে পারে বাতাস বা মেঘের সমুদ্রে। এত যে কল্পনাপ্রবণ এই শিশুমন — তাই বলে তারা যে বাস্তবতার কিছুই

বোঝে না, এটাও ভাবা ঠিক নয়। তারা বাস্তবতা যেমন বোঝে, তেমনি নানাবিধ উপকরণ থেকে তারা রসবোধও আহরণ করে। শিশুদের রসগ্রহণ ক্ষমতা বিচার করতে গিয়ে শিশু সাহিত্য বিশেষজ্ঞ এমেলিয়া এইচ মানসন বলেন ঃ

"Children must have their secret lives, and so do we, and each must be respected.'

মনে রাখতে হবে শিশু মানেই অজ্ঞ নয়। আর শৈশব মানেই কিন্তু অজ্ঞতার কাল নয়। তাদেরও অনুভূতি আছে, বুঝার ক্ষমতা আছে। তারাও কম-বেশি পরিবেশ বোঝে, বোঝে জীবন ও বাস্তবতা। প্রশ্ন জাগে, তাহলে এই যে শিশুরা, যাদের অনুভূতি ও সংবেদনশীল হৃদয় রয়েছে, যারা প্রাজ্ঞ না হলেও অজ্ঞ নয়— তাদের জন্য আমরা কী ধরনের সাহিত্যের প্রত্যাশা করবো? এ প্রসঙ্গে জোসেট ফ্রাঙ্ক খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন :

"as we [অর্থাৎ শিশুরা ও বড়রা] read together and share our enjoyments, there can never be complete sharing"

তাহলে সেই একই কথা দাঁড়ালো। শিশু সাহিত্য সহজ, সরল, শিক্ষামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর পর তাতে স্বপ্ন বা কল্পনা যুক্ত হতে পারে। এখন আমরা জোসেট ফ্রাঙ্কের উক্তিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করে সহজেই বলতে পারি, শিশু সাহিত্য তা-ই-

"which provides its reader a positive and whole some experience... whether of emotional empathy, excitements and suspense, vicarious adventure, information, healthy laughter or just plain pleasure. [Your children's Reading Today p.40]

শিশু সাহিত্যের জন্য সুস্থ মানসভঙ্গি খুবই জরুরি। শিশু সাহিত্য বলেই হয়তোবা অনেকেই কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই নেমে পড়েন এই অঙ্গনে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শিশু সাহিত্য রচনা করা অর্থ কোনো ছেলে খেলা নয়। শিশুদের কল্যাণকামী হতে না পারলে তার জন্য শিশু সাহিত্য রচনা করা কীভাবে সম্ভব? বস্তুত শিশুদের মানস গঠন উপযোগী সৎসাহিত্য ছাড়া এই দাবি আর কিছুতেই পূরণ করা সম্ভব নয়। আর্নেস্ট ফিশারের ভাষায় বিষয়টি আর একটু পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তিনি বলেন ঃ

"It clearly refers to an attitude— not a style."

শিশু মানস বিকাশ সাধনে যাদের কোনো প্রকার ইচ্ছা বা কমিটমেন্ট নেই, যারা শিশুদের কল্যাণের দিকে এগিয়ে নেবার জন্য আদৌ কোনো তাগাদা অনুভব

www.pagorikpathagar.org

করেন না— তাদের আর যাই হোক শিশু সাহিত্যে প্রবেশের কোনো অধিকার থাকে না। প্রতিটি পদে পদে বরং তারা লাঞ্ছিত হতে বাধ্য। ম্যাক্সিম গোর্কি বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। তার মতে ঃ

It is hardly feasible that the primitive family and clan could tolerate in their midst members that were idlers, loafers or shrink's of collective labour of finding food protecting life.

শিশু সাহিত্যের বিষয়গত দিক কেমন হওয় উচিত এ প্রশ্নের জবাবে জাপানি এক শিশু সাহিত্যিক বলেছিলেন একটি চমৎকার কথা ঃ

"The world is wide, everything in it can be used to make books for children. But... the them of these should be, "This earth is beautiful! Living is wonderful! Believe in human kind!"

শিশু সাহিত্য সম্পর্কে ম্যাক্সিম গোর্কির আর একটি উক্তি এই যে ঃ

"বিজ্ঞানকে শিশুর কল্পনায় সহায়ক করে তোলা এবং শিশুকেও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে শেখানো আমাদের কর্তব্য।" রচনার সবলতা আর স্বচ্ছ ভঙ্গির নামে তার সাহিত্যিক মান নিচু পর্যায়ে টেনে আনা নিষ্প্রয়োজন। এসবের জন্য চাই শুধু পাকা হাতের কলাকৌশল। যে লেখক ছোটদের জন্য লিখবেন, তাকে তাদের বয়সের দাবির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা তার জন্য অপরিহার্য। এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হলে তার গ্রন্থ কোনো উদ্দিষ্টই খুঁজে পাবে না, সে গ্রন্থ না হবে বড়দের উপযোগী, না ছোটদের।"

শিশু সাহিত্যের ধারাক্রম

জিজ্ঞাসাটি সবার জন্য সমান জরুরি নয়, তবু কেউ কেউ তো অনুসন্ধিৎসু হতেই পারেন। সেটা হলো, শিশু সাহিত্যের বয়স কত? এ প্রসঙ্গে একটি ধারণা থাকা অনিবার্য না হলেও, কম তৃপ্তিদায়ক নয়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম শিশু সাহিত্যের গ্রন্থ কোনটি? এই প্রশ্নের জবাবে এখন প্রায় প্রচলিত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, পৃথিবীর প্রাচীনতম শিশু সাহিত্যের গ্রন্থটির নাম— "কে'জমনির হিতোপদেশ" [The precepts of ke'gemni]। এর বয়স প্রায় ছয় হাজার বছর। এটা রচিত হয়েছিল মিসরে। মজার ব্যাপার হলো, এই যে শিশু সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থটির সন্ধান পাওয়া গেল, এর বিষয়বস্তু ছিল

নীতিকথা ও শিক্ষামূলক। কে'জমনির দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তিই আদর্শস্থানীয়— যিনি ভদ্র, ন্যায়বান এবং সংযমী।

কে'জমনির হিতোপদেশ-এর পাঁচশো বছর পরে রচিত মিসরেই আর একখানি শিশু সাহিত্যের সন্ধান পাওয়া গেল। যার নাম— "টা-হোটেপের হিতোপদেশ।" বিস্ময়করই বটে, এর বিষয়বস্তুও সেই নীতি ও আদর্শবাদ।

ছয় হাজার বছর পূর্বেও, অর্থাৎ কে'জমনির হিতোপদেশ-এর আগেও যে কোনো শিশু সাহিত্য পৃথিবীতে ছিল না, তাইবা কিভাবে নিশ্চিত করে বলা যায়? সন্দেহের কথা বাদ দিলেও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তে দেখা যাচ্ছে, শিশু সাহিত্যের বয়স এখন ছয় হাজার বছর। যে কোনো বিচারেই এটা কম কথা নয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে 'সুত্ত-পাঠক' নামে প্রথম যে শিশুতোষ গ্রন্থটির সন্ধান মেলে তার বয়সও চার হাজার বছর। আর বাংলা শিশু সাহিত্যের বয়স এখন প্রায় দেড় হাজার বছর। বলা যায়, বাংলা ভাষায় শিশু সাহিত্যের গ্রন্থাদির বিকাশ কাল ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে। আঠার শতকের শেষের দিকে প্রকাশিত মোজাম্মেল হকের 'পদ্য শিক্ষা' আমাদেরকে ছড়ার বিষয়ে একটি উৎসের সন্ধান দিয়ে যায়। এর আগেও বোধ করি এই দেশে লৌকিক ছড়া প্রভৃতি Oral Tradition বা বাংলায় মানুষের মুখে মুখে ফিরে চলেছে। সেটাই বরং স্বাভাবিক। কারণ বাংলার মাটি ও আবহাওয়া বরাবরই কাব্য-সাহিত্যের অনুকূল বৃষ্টিতে সিক্ত। এটা সুদৃঢ় সত্য।

অবিভক্ত বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যাদের অবদান সবচেয়ে বেশি, তাদের মধ্যে সুকুমার রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সুনির্মল বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আবার রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, কায়কোবাদ, জসীমউদ্দিন, কাজী কাদের নেওয়াজ, ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব প্রমুখের নাম প্রতিনিধি হিসেবেও উঠে আসে।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের পর আমাদের শিশু সাহিত্যের জন্য একটি নিজস্ব বিচরণ ভূমির প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে জসীম উদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, খান মঈনউদ্দিন, ফররুক আহমদ, আহসান হাবীব, শেখ ফজলল করীম, বেগম সুফিয়া কামাল, মোহাম্মদ মোদাব্বের, বন্দে আলী মিয়া, হাবীবুর রহমান, রোকনুজ্জামান খান, হোসনে আরা প্রমুখ অন্যতম। অবশ্য এদের সহযাত্রী ছিলেন আরো অনেকেই।

www.nagorikpathagar.org

এই লেখকদের পাশাপাশি শিশু সাহিত্যে স্মরণীয় ভূমিকা রাখলেন আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, আল মাহমুদ, শামসুর রহমান, এখলাসউদ্দিন আহমেদ, আবদার রশীদ, হাসান জান, আল কামাল আবদুল ওহাব প্রমুখ।

ষাটের দশকে এসে আমাদের শিশু সাহিত্যের জমিনটি আরও বেশি উর্বর হয়ে উঠলো। এই সময়ে প্রবীণদের পাশাপাশি আমরা অসংখ্য নতুন লেখককে পেলাম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— ফজল-এ-খোদা, আখতার হুসেন, আল মুজাহিদী, আসাদ চৌধুরী, শামসুল ইসলাম, আলী ইমাম, আবু সালেহ, মসউদ-উশ-শহীদ, সৈয়দ শামসুল হুদা, হোসেন মীর মোশাররফ, সুকুমার বড়ুয়া, সাজজাদ হোসাইন খান, শাহাবুদ্দীন নাগরী, খালেক বিন জয়েনউদ্দিন, জুবাইদা গুলশান আরা, নয়ন রহমান, দিলারা মেসবাহসহ অনেকেই।

আনন্দের বিষয় হলো, সত্তর, আশি এবং নব্বই-এর দশকে এসে এই সংখ্যা বেড়ে অজস্রতায় রূপ লাভ করে। এই সময়ে কতশত নতুন প্রতিভাদীপ্ত মুখ যে শিশু সাহিত্যের উপকূলে নোঙ্গর ফেলেছেন— তা হিসাবের বাইরে। সন্দেহ নেই, এই তিন দশকের দলটি অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অধিক ভারী। শিশু সাহিত্যিক বলতেই এখন যাদের নামগুলো জিহ্বার ডগায় এসে পড়ে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য— রোকেয়া খাতুন রুবী, মতিউর রহমান মল্লিক, আবদুল হাই শিকদার, খালেক বিন জয়েন উদ্দিন সোলায়মান আহসান, ফারুক হোসেন, ফারুক নওয়াজ, লুৎফর রহমান রিটন, আনওয়ারুল কবীর বুলু, আমীরুল ইসলাম, আহমদ মতিউর রহমান, ইকবাল করিম রিপন, সুজুন বড়ুয়া, রহিম শাহ, বাপী শাহরিয়ার, টিপু কিবরিয়া, ইসমাঈল হোসেন দিনাজী, আবদুল হালীম খাঁ, আহমদ আখতার, সৈয়দ মাহবুব রেজা, আসাদ বিন হাফিজ, দিলওয়ার বিন রশীদ, শরীফ আবদুল গোফরান, নাসির হেলাল, মহিউদ্দিন আকবর প্রমুখ।

এদের চেয়ে কিছুটা নবীন হলেও যারা শিশু সাহিত্যের বেগবান স্রোতধারার সহযাত্রী, তাদের মধ্যে সহজেই মনে পড়তে পারে বহু জনের নাম। সুযোগের অভাবে সবার নাম নেয়া এখানে সম্ভব না হলেও কিছু মুখের উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন— আহমদ সাকী, মানসুর মুজাম্মিল, গোলাম মোহাম্মদ, নূরুজ্জামান ফিরোজ, রফিক মুহাম্মদ, আবদুল কুদ্দুস ফরিদী, জাকির আবু জাফর, ওমর বিশ্বাস, সাজ্জাদ বিপ্লব, কাজী কেয়া, শাহ আলম বাদশা, মনসুর আজিজ, হারুন আল রাশিদ, আহমদ বাসির, আলতাফ হোসাইন রানা, জামান সৈয়দী, আতিক হেলাল, জাকির আজাদ, আফসার নিজাম উদ্দিন প্রমুখ।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের ছড়া

১৯৪৭ সালে অর্জিত পাকিস্তান, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা আন্দোলন-এসব কিছু মিলিয়ে আমাদের শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারটি বিষয়-বৈচিত্র্যে ভরে উঠেছে। প্রকাশনার খরাকাল কেটেছে বৈকি। '৪৭-থেকে এ পর্যন্ত প্রতি বছরই কতশত গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, লেখা হচ্ছে তার চেয়েও বেশি।

সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন লেখক ও গ্রন্থের সংখ্যা আজ অগণন, তেমনি বিষয়গত দিক দিয়েও এসেছে নবতর জোয়ার। 'হাট্টিমা টিম' থেকে বেরিয়ে আমাদের শিশু সাহিত্য এখন ছুটে চলছে অজস্র ধারায়।

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য-বিশেষ করে আমাদের ছড়া-কবিতায় কী যে উৎকর্ষ এসেছে তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দেয়া আবশ্যক বলে মনে করি।

এক্ষেত্রে প্রথমেই যার নামটি উচ্চারিত হবার দাবি রাখে, তিনি হলেন কবি জসীম উদ্‌দীন।

ছোটদের নিয়ে জসীম উদ্‌দীনের জগৎ ছিল বিশাল। স্নেহে, কোমলতায়, ভাবে, বিষয়ে সর্বক্ষেত্রে তার আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। একটা বিশাল দরদি হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিই আমাদের বাংলাদেশের প্রথম সার্থক ছড়াকার। তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'হাসু' প্রকাশিত হয় তার সাহিত্যিক জীবনের আদিপর্বে, ১৯৩৩ সালে, মতান্তরে ১৯৩৮-এ। জসীম উদ্‌দীনের মানসভূমি কেমন ছিল? এই গ্রন্থ থেকে একটু উদাহরণ দেয়া যাক :

...এই খুকিটির সঙ্গে আমার আলাপ যদি হয়
সাগর পারের ঝিনুক হয়ে ভাসবো সাগরময়।
রঙীন পাখীর পালক হয়ে ঘুরবো বালুর চরে,
শঙ্খমোতির মালা হয়ে দুলব ঢেউ-এর পরে।
তবে আমি ছড়ার সুরে ছড়িয়ে যাব বায়,
তবে আমি মালা হয়ে জড়াব তার গায়।

হাসুটা কে? কবির ভাষায় :

হাসু একটি ছোট্ট মেয়ে এদের মত— তাদের মত,
হেথায় হোথায় ছড়িয়ে আছে খোকা-খুকু যেমনি শত।
নয় সে চাঁদের চাঁদকুমারী তারার মালা গলায় পরে

চালায় না সে চাঁদের তরী সারাটা রাত গগন ভরে।...
তবু তারে ভালই লাগে চাঁদের দেশের চাঁদের মেয়ে-
শঙ্খমালা, কঙ্কমালা, রঙ্গমালা সবার চেয়ে।
কারণ সে যে ওদের মত, তাদের মত, সবার মত,
হেথায় হোথায় খোকা-খুকু হাসে খেলে যেমনি শত।
অনেক তাহার পুতুল আছে, খেলনা আছে, দোলনা আছে,
যেমনি আছে আমার কাছে, তোমার কাছে, সবার কাছে।
তাই তাহারে আদর করে সবই শিশুরে আদর করি,
শুনিয়ে তারে রূপকথা যে সকল শিশুর পরাণ ভরি।.....

জসীম উদ্‌দীন সময়ের দাবিও পূরণ করেছেন। যুগযন্ত্রণার ছাপ তার কবিতায় উঠে এসেছে সাবলীল ভঙ্গিতে। যেমন—

'ওগো তোমার পায়ে পড়ি চারটি আনা দেবে কি ধার?
সারাটি দিন পাইনি খেতে, পেটটি জ্বলে জ্বালায় ক্ষুধার।'

কিংবা—

ছদন শেখের কন্যা আমি, অনাহারে বাপ মরেছে,
জনমদুখী মা-জননী, সেও তাহারি সঙ্গে গেছে।

বেগম সুফিয়া কামাল মাত্র কয়েকটি শিশুতোষ কবিতা দিয়েই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। তার 'আজিকার শিশু'র কথা কে না জানে? কী ব্যঞ্জনাধর্মী লক্ষ্যাভিসারী উচ্চারণ:

'আমাদের যুগে আমরা যখন খেলেছি পুতুল খেলা
তোমরা এ যুগে সেই বয়সেই লেখাপড়া কর মেলা।'

.....

'পাতালপুরীর অজানা কাহিনী তোমরা শোনাও সবে
মেরুতে মেরুতে জানা পরিচয় কেমন করিয়া হবে?
তোমাদের ঘরে আলোর অভাব কভু নাহি হবে আর
আকাশ-আলোক বাঁধি আনি দূর করিবে অন্ধকার।'

.....

'তোমরা আনিবে ফুল ও ফসল পাখি-ডাকা রাঙা ভোর
জগৎ করিবে মধুময়, প্রাণে প্রাণে বাঁধি প্রীতি ডোর।'

www.nagorikpathagar.org

বেগম সুফিয়া কামালের আর একটি বিখ্যাত ও বহুল প্রচলিত ছড়া হলো :

গোল করোনা গোল করোনা
ছোটন ঘুমায় খাটে,
এই ঘুমকে কিনতে হলো
নওয়াব বাড়ীর হাটে।
সোনা নয় রূপা নয়,
দিলাম মোতির মালা,
তাইতো খোকন ঘুমিয়ে আছে
ঘর করে উজালা।

কবি ফররুখ আহমদ আমাদের শিশু সাহিত্যে এক বিশাল মহীরুহ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্যাপকতায়, বিষয়ে তার রচনা অতুলনীয় এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ। চিড়িয়াখানা, নতুন লেখা, পাখির বাসা, হরফের ছড়া'র কথা তো প্রসঙ্গত উঠবেই। এ ছাড়াও মনে করি, তিনিই আমাদের ছড়ার প্রকৃত আধুনিকতার রূপকার। ভাষায়, বর্ণনায় এবং বিষয় ও ছন্দে তার কবিতা বরাবরই অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। যেমন একটি উদাহরণ :

'ফাল্গুনে শুরু হয় গুনগুনানি
ভোমরাটা গায় গান ঘুম-ভাঙানি,
একঝাঁক পাখী এসে ঐকতানে
গান গায় একসাথে ভোর বিহানে,
আজানের সুর মেশে নীল আকাশে
শিরশির করে ঘাস হিম বাতাসে।'

.....

'আচানক দুনিয়াটা আজব লাগে।
আড়মোড়া দিয়ে সব গাছেরা জাগে,
লাল নয়, কাল নয়, সবুজ ছাতা
জেগে ওঠে একরাশ সবুজ পাতা,
হাই তুলে জাগে সব ফুলের কুঁড়ি
প্রজাপতি ওড়ে যেন রঙিন ঘুড়ি।'

কবি হাবিবুর রহমানের ছড়া থেকে কিছুটা এখানে আবৃত্তি করা যাক ঃ

"বর্ষা এলো আকাশ জুড়ে মেঘে মেঘে,

www.pathagar.com

বর্ষা এলো জষ্ঠি মাসের ঝড়ের বেগে....
ডোবার পারে দীঘির ঘাটে নদীর বাঁকে,
সাঁজের বেলা বাঁধের ঝোপের ব্যাঙের ডাকে.....
পুঁইয়ের মাচায় কলমী লতায় সবুজ বাগে,
শুকনো ডাঙ্গায় গজিয়ে-ওঠা পাতার রাশে....
বর্ষা নামে রিমঝিমিয়ে নাচের চালে,
বাঁশের বনে টাপুর টুপুর গানের তালে....
মাঠের বুকে টোকার পরা চাষীর মাথে,
ধানের শীষে ঘরের চালে আঁধার রাতে....
ঝরঝরিয়ে ঝরঝরিয়ে বকের পাখায়,
হারিয়ে যাওয়া পিছল পথে তালের ছাতায়।"....

আহসান হাবীবের 'মেঘনা পারের ছেলে'র সাথে আমরা সবাই পরিচিত। তার লৌকিক ঢঙের আর একটি ছড়ার সাথে একটু পরিচিত হই :

হাটে যাবো হাটে যাবো ঘাটে নেই নাও
নিঘাটা নায়ের মাঝি আমায় নিয়ে যাও।
নিয়ে যাবো নিয়ে যাবো কত কড়ি দেবে,
কড়ি নেই কড়া নেই আর কিবা নেবে?
সোনা মুখে সোনা হাসি তার কিছু দিও,
হাসিটুকু নিও আর খুশিটুকু নিও।

শিশু সাহিত্যের প্রথম দিককার বিষয় ছিল শিক্ষা ও শিশু মনোরঞ্জন বা আনন্দদান। দ্বিতীয় স্তরের শিশু সাহিত্যে যুক্ত হলো ঘরোয়া পাঠ। কিন্তু উপেক্ষিত হলো এই সাহিত্যে দেশ, সমাজ, বিশ্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, সংঘাত, অভ্যুদয়, সংকট প্রভৃতি বিষয়। শিশুদের ব্যাপক দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেল এই জীবনঘনিষ্ঠ ও প্রতিবেশগত বিষয়গুলো। কিন্তু তৃতীয় স্তরে এসে আমাদের শিশু সাহিত্যিকদের মধ্যে ঘটে এক আশ্চর্যজনক বিপ্লব।

তাদের লেখা পূর্বের বিষয়গুলোর পাশাপাশি স্পর্শ করলে সামগ্রিকতার আকাশ। এখানে এসে আমাদের শিশুরা কেবল পরীর পাখায় ভর করে চাঁদের দেশে যায় না, বরং তারা পরিচিত হয়ে উঠলো জীবন, যুগ ও সমাজের সাথেও। সঙ্গত কারণে মনে পড়াই স্বাভাবিক বহুল পরিচিত ও পঠিত সেই ছড়াটির কথা ঃ

"খোকা ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো

www.pathagar.org

বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে?
ধান ফুরালো, পান ফুরালো
খাজনার উপায় কি?
আর কটা দিন সবুর করো
রসুন বুনেছি।'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই একটি মাত্র ছড়ার মাধ্যমেই ছোটরা পরিচিত হয়ে উঠলো লুটেরাদের অত্যাচারের সাথে। তারা জেনে গেল আমরা কতই না অসহায় ছিলাম শোষণের সামনে। শুধু সামাজিক বঞ্চনা নয়, পরবর্তীতে আমাদের শিশু সাহিত্যের বিষয় হিসাবে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের শিশু সাহিত্যের মানবতাবাহী সুবাতাস আন্তর্জাতিকতার আকাশও স্পর্শ করেছে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষত ছড়া খুবই বলিষ্ঠ ও সোচ্চার। আমাদের ছড়া এখন মনোরঞ্জন ও আনন্দের কোলাহল থেকে উঠে এসে জনসম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদের প্রতিভাসও তার পরতে পরতে লক্ষ্য করা যায়।

ছড়ায় প্রতিবাদী চেতনা

বাংলা সাহিত্যের আদি ও অকৃত্রিম অনুষঙ্গ হলো ছড়া। সেই কবে থেকে এর যাত্রা শুরু, তা আজ আর হিসাব কষে সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। কারণ, ছড়ার লিখিত রূপের আগেও এর বহুল প্রচলন ছিল মুখে মুখে। আজও আছে। ছড়া হলো সাহিত্যের প্রাচীনতম একটি অনিবার্য এবং উজ্জ্বলতম মাধ্যম। এক অর্থে একজন কবির জন্য প্রাথমিক পাঠশালাও বটে। ছড়ার মধ্য দিয়ে শব্দ ও ছন্দের ওজন প্রকৃতি-মেজাজ প্রভৃতি ঠিক করে নেয়া যায়। ঠিক যেন রুলটানা কাগজে লিখে লিখে হাতের লেখা সোজা ও সুন্দর করার চেষ্টা করা। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ছড়া খুব সহজ ও সস্তা কোনো বিষয়। বরং এর রয়েছে এক অপরিসীম ক্ষমতা। বাংলা কবিতার সাথে তাই ছড়াও অনিবার্য ও যুক্ত হয়ে আছে। একটা সার্থক, কালজয়ী ছড়া লিখতে পারা, হাজারটি ব্যর্থ কবিতা রচনার চেয়েও উত্তম। ছড়াকে অনেকেই হালকা চোখে দেখেন, এটা ঠিক নয়। ছড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে এর চেয়ে প্রত্যক্ষ কার্যকরী আর কোনো মাধ্যম আছে বলে মনে হয় না।

www.nagorikpathagar.org

এখন গদ্য কবিতার মত ছড়াকেও কেউ কেউ গদ্যে রূপান্তর করতে আগ্রহী দেখে হাসি পায়। যদি ছন্দই না থাকলো, তবে আর ছড়া কিসের? ঘোড়া ছুটছে, তার একটি ছন্দ আছে। বৃষ্টি, ঝরনা, হাঁটা-চলা, জীবন, সব কিছুতেই ছন্দ আছে। ছন্দহীন জীবন— সে কেবল মৃত, লাশ। ঠিক তেমনি ছড়ার মূল প্রাণ হলো ছন্দ। ছন্দহীন ছড়া– সে কেবল মৃত মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার মত ব্যর্থ ও নির্মম পরিহাস। ছড়ার জন্য ছন্দ যে অপরিহার্য ও অনিবার্য, এর মধ্যে কোনো দ্বিধা বা সংশয় থাকার কথা নয়।

রাজনীতির পালাবদল কিংবা সমজ বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবেও ছড়া ব্যবহৃত হয়। সংকটে, সংক্ষোভে ছড়াও সমান জ্বলে উঠতে পারে। ছড়াও জ্বালাতে পারে দ্রোহের দাবানল। কারণ ছড়ার আক্রমণটা হয় সরাসরি। সুতরাং তীরের ফলাটাও সেইভাবে বিঁধে যেতে পারে, যদি সেটা হয় লক্ষ্যভেদী। আমাদের দেশেও এধরনের অনেক ছড়া লেখা হয়েছে। এখনো হচ্ছে বৈকি। এই মুহূর্তে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদী ছড়া-সংকলনের নাম মনে পড়ছে। রাজপথের ছড়া, বরাক বাঁশ, সময়ের ছড়া, স্যাটানিক ভার্সেস বিরোধী ছড়া, ষড়যন্ত্রবিরোধী ছড়া, ফাগুনের ছড়া, [আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছড়া] চোখ [২য় সংখ্যা] প্রভৃতি সংকলন এক সময় দারুণ তোলপাড় তুলেছিল। মনে করি সংকট যতদিন আছে, ততোদিনই এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

ছড়া যে কতটা আক্রমণাত্মক ও লক্ষ্যভেদী হতে পারে, তার কিছুটা নমুনা এখানে তুলে ধরবো। ধরা যাক আল মাহমুদের 'ঊনসত্তরের ছড়া'র কথা। কী ভয়ঙ্কর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে তার ছত্রে ছত্রে :

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
শুয়োর মুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।
কেন বাঁধবো দোর জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।
ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।

www.pathagar.net

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে!
তোরাই তবে সোনামানিক
আগুন জ্বেলে দে।

আবার 'ঊনসত্তরের ছড়া' [দুইয়ে] আল মাহমুদ কারফিউয়ের বিরুদ্ধে কীভাবে দ্রোহের নিশান তুলেছেন দেখা যাক :

কারফিউরে কারফিউ,
আগল খোলে কে?
সোনার বরণ ছেলেরা দেখ্
নিশান তুলেছে।
লাল মোরগের পাখার ঝাপট
লাগলো খোয়াড়ে
উটকোমুখো সান্ত্রী বেটা
হাঁটছে দুয়ারে।
খড়খড়িটা ফাঁক করে কে
বিড়াল ডাকে 'মিউ',
খোকন সোনার ভেংচি খেয়ে
পালালো কারফিউ।

আর সাজজাদ হোসাইন খানের প্রত্যাশাই হলো :

ছড়া হোক যুদ্ধের চকচকে তরবার
দেশটারে গড়বার
সত্যেরে ধরবার
সাহসের সাথে শুধু মন দিয়ে লড়বার।
ছড়া হোক যুদ্ধের ক্ষুরধার তরবার
মোঘলের দরবার
তেজি ঘোড়া চড়বার
শহীদের হাত ধরে বারে বারে মরবার।

'স্যাটানিক ভার্সেস'-এর প্রতিবাদে বাংলাদেশেও জ্বলে উঠেছিল ছড়ার আগুন। মার্চ, ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত এই প্রতিবাদী ছড়া সংকলন থেকে কিছু তুলে ধরছি।

আবু সালেহ-এর উচ্চারণ :

১. কান ধরে উঠ্ বস্
ঘাড়টাকে মটকাও
শয়তান রুশদীকে
চটকাও, লটকাও।
স্যাটানিক ভার্সেস
দাও জুটে পুড়িয়ে
তার পিছে রয় যারা
দাও ঠ্যাং গুঁড়িয়ে।
কথা নয় ফুসফাস
করো তাকে হত্যা,
পৃথিবীতে কেউ নেই
দেয় নিরাপত্তা।
[ঘাড়টাকে মটকাও]

২. মানুষের জয় চাই
অসুরের ক্ষয় চাই
দূর হোক নাস্তি
মানুষের হাসি চাই
রুশদীর ফাঁসি চাই
চাই তার শাস্তি।
[রুশদীর ফাঁসি চাই।। মসউদ-উশ-শহীদ]

ছড়া অনেক সময় সামাজিক দায়িত্ব পালনেও এগিয়ে আসে। এগিয়ে আসে দেশের স্বার্থে, গণ-মানুষের কল্যাণে। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে জুলুম-শোষণ আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। এমনি একটি ছড়া সংকলন 'বরাক বাঁশ'। 'ছড়ায় গণ আদালতীদের আমলনামা' হিসাবে এটা ছিল একটি চমৎকার দর্পণ।

একমাত্র ছড়াতেই তো এভাবেই বলা সম্ভব :

"চারদিকে ঘনঘটা
যুদ্ধের বাজনা
আবার কি দিতে হবে
রক্তের খাজনা?"

www.banglainternet.com

এইভাবেই বয়ে চলেছে আমাদের ছড়া। বয়ে চলেছে বিক্ষোভে, বিদ্রোহে আবার শান্তি ও সৌহার্দ্যে। ছড়া বয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে, অজস্র প্রস্রবণে। এই গতি সতত ধাবমান।

আমাদের ছড়ার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলেই বিশ্বাস করি। বেশ কিছু তরুণকে ছড়ার ব্যাপারে আন্তরিক দেখে এই বিশ্বাসটাকে আরও সম্প্রসারিত করতে পারছি। তবে একটা আশংকার কথাও বলে রাখি। আমাদের দেশে অনেকেই শুরুটা করেন ছড়ার মাধ্যমে। কিন্তু পরক্ষণে, হাতটা না পাকতেই ছড়া বা মিলযুক্ত কবিতা থেকে লাফিয়ে পড়েন গদ্য কবিতার প্রান্তরে। কেউ আর 'ছড়াকার' থাকতে চান না। রাতারাতি হতে চান 'কবি'। এর মূলে সম্ভবত 'কবিখ্যাতির' মোহটা উসকে ওঠে। ফলে যেটা হয়— তারা না পারেন 'ছড়াকার' হতে, আর না পারেন 'কবি' হতে। মাঝখানে এক ধরনের ব্যর্থ আস্ফালন, হাস্যকর অহমবোধ, আর নিকৃষ্ট আত্মতৃপ্তিতে বুঁদ হয়ে থাকেন। এটাকে বলা যায়— আত্মহনন। এই আত্মহননের প্রবণতা পরিহার করা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, যিনি দক্ষ তিনিই সফল। সেটা শিল্পের যে কোনো মাধ্যমেই হতে পারে। রবীন্দ্র, নজরুল, ফররুখ— তারা কী কবিতায়, কি ছড়ায়— কোন্‌খানে সার্থক ও সফল নন? আবার অনেকেই ছড়ার টেকনিকটাই আয়ত্ত করতে পারেননি। ছড়া লেখা যে আদৌ কানো সহজ ও হেলাফেলার কাজ নয়, এই বোধটাও অনেকের মধ্যে পুষ্ট হয়নি দেখে কষ্ট লাগে।

এইসব সংকট কাটিয়ে উঠতে পারলে আমাদের দেশে আরও বেশি সফল ও সমৃদ্ধ ছড়া রচিত হতে পারে। কারণ এই সবুজ, সুন্দর, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে টইটম্বুর দেশটি ছড়া-কবিতার জন্য একটি চমৎকার উর্বর ক্ষেত্র।

শিশু সাহিত্যে ছোটগল্প ও অন্যান্য

শিশু-কিশোররা গল্প শুনতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। শুধু বেশি বললেও কথাটি সম্পূর্ণ হয় না, বরং বলা ভাল, তারাই প্রকৃত অর্থে গল্পমগ্ন পাঠক এবং শ্রোতা। গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েনি, কিংবা এখনও পড়ে না— এমন কেউ কি আছে? দাদা-দাদী, নানা-নানী, পিতা-মাতা, কিংবা বড় ভাই-বোনকে গল্প শোনানোর জন্য বায়না ধরেনি— এমনও কেউ নেই। তারাও বাধ্য হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন ছোটদেরকে গল্প শুনাতে।

প্রশ্ন হলো— কী গল্প? কোন্ গল্প আমরা বলছি বা শেখাচ্ছি আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ, সেই সব সোনালি শিশুদেরকে? বহুকাল থেকেই চলে আসছে ঠাকুরমার

www.pathagar.org

ঝুলি, গোপাল ভাঁড়ের গল্প, ঈশপের গল্প প্রভৃতি। আমাদের পূর্বে, সম্ভবত বহু পূর্ব থেকেই— এমনিভাবে যুগের পর যুগ, কালের পর কাল ধরে চলে আসছে ঐ একই ধারার গল্পস্রোত।

কিছুটা পালাবদলের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল বটে সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে। কোনো কোনো সচেতন বিবেকে আঘাত করেছিল মৌলিক প্রশ্নটি, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে কি শেখাচ্ছি? ছোটদের গল্প বলতেই কি ভূত-প্রেত, রাক্ষস, দৈত্য-দানব, রাজা-রাণী, রাজপুত্র, রাজ্য জয় কিংবা উদ্ভট-অবাস্তব অপকাহিনীর অপলাপমাত্র? সে কি কেবল নীতি-নৈতিকতাহীন, শিক্ষা ও সংযমহীন, চরিত্র ও আদর্শহীন-ভয়তাড়িত, গা-ছমছম করা কেবলই শব্দের বুনোট? না-কি এমন গল্পের দরকার, যেসব গল্প শুনলে আমাদের সন্তানেরা জেগে উঠতে পারে সাহসী রোদ মেখে স্বপ্ন-বাস্তবতার সুউচ্চ পর্বতে! যে গল্পে আছে মানুষ, আছে সাহস, সংযম, ধৈর্য, নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, বড় মানুষ হবার স্বপ্ন এবং আত্মত্যাগের এক মহান শিক্ষা!

স্বীকার করতেই হবে, হারাধনের সাতটি ছেলে, রাম লক্ষণ সীতা, ভোম্বল-গোপাল কিংবা সেইসব দৈত্য-দানব আর রাজপুত্র-রাজকুমারী কখনই হারিয়ে যায়নি সমাজের মগজ থেকে। তবে যেটুকু চৈতন্যের উদ্ভব ঘটেছিল তার ফলেই একদা এদেশে কিছুটা অনূদিত হলো শেখ সাদী, মোল্লা নাসিরুদ্দিন, রুমী প্রমুখের গল্প। সামান্য, খুবই সামান্য এবং তার চেয়েও লজ্জার কথা, আমরাই সেইসব হীরা-মণি-মাণিক্য চিনে উঠতে ব্যর্থ হয়েছি। যার কারণে এর ব্যাপ্তি ঘটেনি তেমনভাবে। সেই সাতচল্লিশ-উত্তর কালেও গাঁ-গেরামের কয়টি চাল ফুঁড়েই বা এদের গল্প বারান্দায় উঠতে পেরেছিল? কজন দাদা-দাদী, কিংবা নানা-নানীর মুখেই বা এসব গল্প প্রবেশ করতে পেরেছিল? পারেনি সেইভাবে, কারণ এসব গল্প পাঠ এবং ছোটদেরকে শেখাবার তাকিদটা কখনও তেমনভাবে অধিকাংশরাই অনুধাবন করতে পারেননি। আবার বাস্তবতাও ছিল। অশিক্ষায় পঙ্গু, তার চেয়েও অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ পরিবারগুলোর ঘরে জমাটবাঁধা আঁধারের পর্বত ডিঙ্গিয়ে এতটুকুও সুশীল আলো প্রবেশের পথ পায়নি। সামান্য কিছু শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে চেতনাটি জাগ্রত হয়েছিল বটে, কিন্তু বসন্তের বাতাসের মত তা আমাদের দেশের সকল গৃহকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এসব ব্যর্থতার দায় কখনই অশিক্ষিত, কিংবা অসচেতন গরীব ক্ষেত-মজুরের ঘাড়ে সওয়ার হতে পারে না। তাদের ওপর এই দায় চাপানোটাও নেহায়েত অবিচার এবং অন্যায়। কিন্তু দায়টা ছিল কাদের? আমাদের সেইসব অগ্রজ, যারা

www.pathagar.com

আলোকিত হয়ে উঠেছিলেন— তারা কি তাদের চারপাশকে আলোকমুখর করে তোলার জন্য এতটুকু দায় অনুভব করেছিলেন? যদি করতেন তাহলে নিশ্চিত, যদু-মদু আর ভূত-প্রেতের চেয়েও আমাদের কাছে প্রিয় এবং মধুর হয়ে উঠতে পারতো কতসব আলো-ঝলমল মহা মূল্যবান গল্প।

আজকের দিনে, বিশেষ করে আমাদের বয়সী যারা— চল্লিশ অতিক্রমী প্রায় প্রত্যেকেই বোধ করি শিশুকালে অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম সেইসব ভূতের গল্প শুনে। তারপর ছাত্রজীবনের সেই প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল মূলত শেখ সাদীদের গল্পের সাথে পরিচয়। যেটুকু পাঠ্য বইয়ে ছিল, মূলত পুঁজি ছিল সেইটুকু। তারপর যাদের যেটুকু আগ্রহ ছিল— তারা ততটুকু সংগ্রহ করে পড়েছেন। কিন্তু সার্বিক অর্থে, একটি জাতির শিশু-মানস গঠনের জন্য যে ধরনের ভূমিকা রাখা জরুরি ছিল— তার একাংশও কেউ পালন করেন নি। মনে আছে, শেখ সাদীর বেশ কিছু গল্প, হাজী মুহাম্মদ মহসীন, মুসলিম শাসক, বীর-যোদ্ধা, রাসূল [স] ও তাঁর চার খলিফার সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী এবং ইতিহাস পাঠ্যতালিকায় যৎকিঞ্চিৎ থাকার কারণে তবুও ভাল, কিছুটা তৃপ্তি বোধ করতাম। কিন্তু এটাতো সত্য, 'ঠাকুর-গনেশ'কে ছাপিয়ে যে ধরনের ব্যাপ্তি এবং বিকাশ কাম্য ছিল তার কতটুকু আবেদনই বা বিস্তার লাভ করেছিল? করেনি, তার কারণ ঐ একটিই। যারা বিস্তার এবং বিকাশের ভূমিকায় ছিলেন, তাদের উদাসীনতা, অসচেতনতা, সর্বোপরি দূরদর্শিতার অভাবটি চরমভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাদের সেই কূপমণ্ডুকতার খেসারত কি আজ আমাদের দিয়ে যেতে হচ্ছে না? তারা ইচ্ছা করলে পারতেন, খুব সহজেই পারতেন নীতি-নৈতিকতা আর আদর্শ ও শিক্ষণীয় গল্পের এক বিরাট-বিশাল সমুদ্র বিস্তার করতে। তখনকার দিনেও ঘরে ঘরে এসব গল্প পৌঁছে দেয়া মোটেও কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল না। সামর্থ্য ছিল বটে, কিন্তু সেই উদ্যম আর মানসিকতা ছিল না। এটাই আমাদের জন্য আজও বেদনার বিষয় হয়ে রইলো।

সাতচল্লিশ-উত্তর এদেশের পাঠ্য বইয়ে যতটুকু নীতি-নৈতিকতা এবং আদর্শিক শিক্ষামূলক গল্প-ইতিহাস প্রভৃতি ছিল, যা শিশু-মানস গঠনে ছিল সহায়ক— সেটুকুও কালক্রমে বিলুপ্ত হলো। যতই কষ্টের বিষয় হোকনা কেন, বাস্তবে তো এটাই ঘটলো— একাত্তরের স্বাধীনতা-উত্তর যেসব পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করা হলো, তাতে আর যাই থাকুক না কেন, আগের সেইসব গল্প-ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হলো। ইসলাম তো দূরের কথা, মুসলিম সেন্টিমেন্টকেও সেখানে অবহেলা করা হলো। কোথায় আর হাজী মহসীন, মুহাম্মদ আলী,

www.nagorikpathagar.org

শওকত আলী, শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর? সেই সব জায়গা দখল করে নিল কালক্রমে সূর্যসেনরা'। শেখ সাদী, রুমীর গল্পের পরিবর্তে, এই এখন আমাদের বাচ্চাদের স্কুলপাঠ্য হিসাবে পড়তে হয় টোনাটুনির গল্প, গোলের কপাল, বানরের রুটিভাগ, শেয়ালের পাঠশালা, ডাইনী বুড়ি প্রভৃতি। নগরকেন্দ্রিক প্রতিটি স্কুলের গেটের সামনে অদ্ভূত সব মাল্টিকালারের ঝকমকে প্রচ্ছদে শোভিত শতশত গল্প-বই এর সার সাজিয়ে রাখে এক শ্রেণীর বিক্রেতারা। তারা খুব কম দামে কিনে চড়া দামে এসব বই তুলে দেয় কিশোরদের হাতে। টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে কিংবা অন্যভাবে পিতা-মাতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই অর্থে কিনে আনছে তারা এসব বই। কৌশলে তাদেরকে কি বই পড়ানো হচ্ছে? আফসোসের বিষয় বটে, তারচেয়েও অনেক বেশি আশংকার কথা! এইসব হলো— 'জোলা আর সাত ভূত', 'গোপাল ভাঁড়ের গল্প', 'রাক্ষসী-রাজকন্যা', 'হাসির গল্প'- ধরনের সেই পুরনো, অতি পরিচিত এবং ততোধিক অমার্জিত ভুলে ভরা বই। ছোটরা যেহেতু গল্প শুনতে, বলতে এবং পড়তে ভালবাসে, সেই কারণে এক শ্রেণীর সুচতুর ধূর্ত জ্ঞানপাপী সেই সুযোগের পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেই চলছে। ভাবা যায়, আমাদের সন্তানরাই এসব বই পড়ে লুকিয়ে, চুপিচাপে কিংবা প্রকাশ্যে!

সন্দেহের অবকাশ নেই, স্কুলপাঠ্য থেকেই তারা উদ্বোধিত এবং উৎসাহিত হচ্ছে এইসব বই-এর প্রতি। যেহেতু তাদের পাঠের তৃষ্ণা ও জানার স্পৃহা প্রবল, সেই কারণে যা সামনে এবং সহজে পাচ্ছে তাই পড়ছে এবং শিখছে।

যারা ভাবতে পারেন এবং কিছু করতে পারেন, তাদের জন্যই বলা— আমাদের সন্তানেরা যে ধরনের গল্প পাঠে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে এবং তার ফলে যে মানসিকতায় বেড়ে উঠছে— তা আগামীর জন্য কতটা আশংকা ও ভয়াবহতার ব্যাপার, সে সম্পর্কে নিশ্চয়ই এখন ভেবে দেখা জরুরি।

এ অবক্ষয় এবং অনাসৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী আমরাই। আমরা বলতে— আমাদের লেখক, প্রকাশক, পত্র-পত্রিকার নিয়ন্ত্রক, বুদ্ধিজীবী এবং চিন্তাশীল শিক্ষিত সমাজ। সম্ভত আমরা কেউই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্বের চোখে দেখিনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমাদের অগ্রজ যে সকল শক্তিমান লেখক-কবি ছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছোটদের উপযোগী, তাদের মানস ও চরিত্র গঠনমূলক তেমন বেশি গল্প লেখেননি। অধিকাংশ বড় বড় কবিরাও কেন জানি এড়িয়ে গেছেন বিষয়টি। যারা কিছু লিখেছেন, তার সংখ্যা ও গুণগত মানও যে সর্বাংশে অগ্রগণ্য— তাও নয়। আবার প্রকাশকদের অনীহা, অজ্ঞতা, ব্যবসায়িক ভেদ-বুদ্ধিতে বেশ ভাল বইও অনেক ক্ষেত্রে পেঁচার দশায় পরিণত হয়ে গেছে। যার

ফলে ইবরাহীম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ লেখকদের কিশোর উপযোগী ভাল বইগুলোর সাথেও আজকের শিশু-কিশোররা পরিচিত হতে পারছে না।

কে না জানে যে, ছোটদেরকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে ভাল বই-এর কোনো বিকল্প নেই। কাদা নরম থাকলে তা দিয়ে অনেক কিছুই তৈরি করা সম্ভব। কাদা শুকিয়ে যখন শক্ত হয়, তখন তা মুঠোয় ভরলে হয়তো ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যায়, নইলে হাতই রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। শৈশব-কৈশোর কালটাই মূলত শিক্ষার কাল। পরবর্তী কালটা তো কেবল অভ্যাসগত চর্চার কাল। সুতরাং আমাদের জাতিকে উন্নত, পরিশীলিত, মর্যাদাবান করে গড়ে তুলতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে অনেক বেশি মনোযোগী হতে হবে আজকের ছোটদের প্রতি। তাদের চরিত্র, আদর্শ, রুচি, নীতি, সাহস, স্বপ্ন— এসব গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদেরই। তাদের প্রতি অবহেলা করা মানেই একটি জাতির ধ্বংস এবং অবক্ষয়ের পথটিকে সুগম করে তোলা। বিষয়টি যত দ্রুত আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব, ততই আমাদের জন্য হবে কল্যাণকর।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

বাংলাদেশের শিশু-সাহিত্যে সার্বিক বিচারে অপূর্ণতাও কম নয়। অতি সম্প্রতি কী ঝড়টাই না যাচ্ছে সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখাটির ওপর দিয়ে। ব্যাপারটি বেশ ঘোলাটে বটে। এখন শিশু সাহিত্যের নামে যা কিছু লেখা হচ্ছে তার প্রায় সবটারই পাঠক মূলত বড়রা। কারণ, নামসর্বস্ব এসব শিশু সাহিত্যে শিশুদের চাওয়া-পাওয়া এবং তাদের হাসি-আনন্দ বা বেদনার বিষয়গুলো থেকে যাচ্ছে প্রায় অনুপস্থিত এবং হিসাবের বাইরে। শিশুদের কোমল দৃষ্টি, কোমল অনুভূতিকে আজকের শিশু সাহিত্য স্পর্শ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ শিশুতোষ সাহিত্যকেও দখল করে নিয়েছে তথাকথিত রাজনৈতিক কড়চা। সত্যি বলতে, এই প্রবঞ্চনার কুফল মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, শিশু সাহিত্যের বই-এর প্রতি যেহেতু শিশু-কিশোরদের ঝোঁক অপরিসীম, সে কারণে তারা প্রতারণার ফাঁদে প্রথম পা দিয়ে পরবর্তীতে সতর্ক হয়ে যায়। অর্থাৎ একটি বই বা একটি লেখা ঝোঁকের মাথায় একবার পড়ার পর আর সেটার ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না। মূলত আমরা ছোটদেরকে ক্রমাগত ঠকাচ্ছি শুধু তাই নয়, প্রকারান্তরে তাদের সাথে প্রতারণা করছি। আর এই প্রতারণার ফল যে আদৌ ভাল হবার নয় সেটা বলাই বাহুল্য।

আমরা অনেকেই একটা ব্যাপারে ভুল করি, তা হলো শিশুদেরকে মনে করি বুদ্ধিহীন, নিতান্তই বোকা। আসলে কিন্তু তা নয়। তাদেরও রয়েছে একটি চমৎকার বোধশক্তি। সেটা রুচি এবং সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও। তাদের আছে দেখার এবং শোনার ক্ষমতা। ভাল-মন্দ বিচারের যোগ্যতা যে তাদের আদৌ নেই, এটা ভাবা নিতান্তই বোকামি। তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বাছ-বিচারের যোগ্যতা যদি না থাকবে তাহলে কেন তারা আজকের শিশু সাহিত্যের অপাঙ্‌ক্তেয় একটি লাইনও আর গ্রহণ করতে চাইছে না? কেন তারা একবার পড়ার পর দ্বিতীয়বার সেটি আর ছুঁয়েও দেখছে না এবং কেনই বা তারা ঘুরে-ফিরে সেই রবীন্দ্র, নজরুল, সুকুমার রায় কিংবা জসীম উদ্‌দীন, ফররুখ আহমদের লেখাই ক্রমাগত আওড়িয়ে যাচ্ছে? প্রকৃত সত্য হলো তারা পড়তে চায়, শিখতে চায়, গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু আমাদের আজকের শিশু-সাহিত্যিকরা তাদের সেই চাহিদা পূরণে সেইভাবে সক্ষম হচ্ছেন না।

অনেকেই নেহায়েত হেলাফেলা অর্থে শিশু সাহিত্যকে বেছে নিয়েছেন। চিকিৎসকের জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন হয় একটি তৃতীয় চোখের। যার এই তৃতীয় চোখ নেই, চিকিৎসক হিসেবে তিনি ব্যর্থ হতে বাধ্য। ঠিক তেমনি শিশু সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন হয় তৃতীয় দৃষ্টির। যে দৃষ্টির সীমানায় স্পষ্ট থাকবে শিশু এবং তাদের মানসপট। সন্দেহ নেই কাজটি যতো সহজ ভাবা হয়ে থাকে, আসলে তা আদৌ সহজ নয়। প্রকৃত অর্থে সবচেয়ে কঠিন কাজটি হলো, শিশুদের জন্য লেখা।

আর একটি ব্যাধির কথাও এখানে এসে যায়। নামে যেহেতু শিশু সাহিত্য, সুতরাং ব্যবসাটা মন্দ নয়। বিশ্বের যে কোনো দেশেই শিশু সাহিত্যের ব্যবসা জমে ভাল। কে না চান তার সন্তানের হাতে একটি ভাল বই তুলে দিতে? এই সুযোগটা গ্রহণ করেন আমাদের দেশের একশ্রেণীর ব্যবসায়ী ও লেখক। তারা ব্যবসার ক্ষেত্রে চতুর, চালাক এবং সতর্ক, কিন্তু শিশুদের মানস গঠনের ক্ষেত্রে একেবারেই বিবেকহীন। পরিণত বয়সীদের অপরিণত লেখায় অতিষ্ঠ ও বিব্রত আজকের শিশুরা। ফলে শিশু সাহিত্যের পাঠকের ক্ষেত্রে এখন বড়রাই প্রধান। বলছি না, 'ঘুম পড়ানি মাসিপিসি' এর মতো ছড়াই কেবল শিশুরা পছন্দ করে, কিংবা এ ধরনের ছড়া বা গল্প-উপন্যাস তাদের জন্য রচনা করা এখনো খুব জরুরি। কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আজকের শিশুদের হাতে যে ধরনের জীবনঘনিষ্ঠ, মানসগঠন এবং তাদের চরিত্রগঠনমূলক সাহিত্য তুলে দেবার প্রয়োজন সেটা তেমনভাবে হচ্ছে না।

www.nagorikpathagar.org

আবার সেই সুকুমার রায়, নজরুল, জসীম উদ্‌দীন কিংবা ফররুখের কাছেই ফিরে আসতে হয়। কী অপরিসীম দরদ দিয়ে, কী অসাধারণ দায়িত্বের সাথে, কী মিষ্টি মধুর শব্দ ও ছন্দের মাধ্যমে তারা শিশুদেরকে আপন করে নিয়েছিলেন। পার্থক্যটা সম্ভবত এখানেই, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি এবং হৃদয়ের। শিশু-সাহিত্য আদৌ যে কিছু হচ্ছে না, তা নয়। হচ্ছে বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আজকের শিশু-সাহিত্যের বিশাল ভূ-ভাগটিই চলে গেছে রাজনীতি, অর্থনীতি আর সমসাময়িক বিবিধ ঘটনা-দুর্ঘটনার দখলে। শিশু সাহিত্য যেহেতু বিকোয় ভাল, সুতরাং ব্যবসার দিকে খেয়াল রেখে লেখক-ব্যবসায়ীরা এখন দারুণভাবে ঝুঁকে পড়েছেন শিশু সাহিত্যের বই লেখা ও প্রকাশের দিকে। বই-এর দোকানগুলোর দিকে চোখ রাখলে বলতেই হবে, আমাদের দেশে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলেছে সাহিত্যের এই মাধ্যমটি। কিন্তু এর অধিকাংশই হাতে নিয়ে পড়তে গেলে তখনই বেদনায় বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে। গল্প-উপন্যাসের নামে, কিংবা ছড়ার নামে শিশুদের সাথে কি মারাত্মক প্রতারণাই না করা হচ্ছে। দু'একটি যে ভাল বই বেরুচ্ছে না তা নয়, কিন্ত সেগুলো ব্যতিক্রমী ঘটনা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকার কথাটাও অনিবার্যভাবে চলে আসে। একসময় এদেশে উল্লেখ করার মতো বেশকিছু উন্নতমানের পত্রিকা ছিল, প্রকৃত অর্থেই যা ছিল শিশু-কিশোরদের পত্রিকা। কমতে কমতে আজ তাও নিঃশেষ প্রায়। কিছু শিশু-পত্রিকা বের হচ্ছে বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই উদ্দেশ্যহীন। শিশুদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব সেখানে কোথায়? কোথায় সেখানে শিশুদের বেড়ে ওঠার, বিকশিত হবার, সুন্দর হবার উপাদান? কোথায় আছে সেখানে শিশুদের প্রাণের স্পন্দন?

চাই শালবৃক্ষ

আমরা চাই শিশুদের হাতে তাদের উপযোগী বই, ভাল বই, সুখপাঠ্য বই তুলে দিতে এবং আমাদের শিশুরাও চায় তাদের প্রিয় কোনো লাইন সারাদিন খেলার ছলে গুন গুন করে পাঠ করতে এবং সেই ছড়ার সাথে কিংবা কোন গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের সাথে একাত্ম হতে। তাদের এই প্রত্যাশা, স্বপ্ন এবং পিপাসার কথা স্মরণে রেখে আমাদের শিশু সাহিত্যিকদের এখন ভাবতে হবে বৈকি। ভাবতে হবে আন্তরিক দরদ আর অকৃত্রিম মমতা দিয়ে। কেননা, আর যাই হোক, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কিংবা অবহেলা করার মতো বিষয় অন্তত শিশু-সাহিত্য নয়। আমাদের বুঝতে হবে, শিশু-সাহিত্য রচনা করা শিশুসুলভ কোন কাজ নয়। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যোগ্যতা এবং সাবধানতার প্রয়োজন বোধ করি অনেক বেশি।

www.pathagar.net

এসব ক্ষেত্রে অবশ্য লেখকের দায়টাই বারবার ঘুরে ফিরে সামনে আসে। কারণ প্রথমত লেখকরাই তো থাকেন উৎসমূলে। কিছুটা আশার কথা বটে, তবে সেটাই তো যথেষ্ট নয়— প্রায় দু'দশক ধরে আমাদের দশে ছোটদের জন্য লেখার একটা গতি লক্ষণীয় বিষয়ে পরিণত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেখানেও খুব বেশি আশান্বিত হবার মত তেমন কিছু দেখা যায় কি? শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা হলেও অধিকাংশ লেখাই হয়ে উঠছে বয়স্কদের। শব্দ প্রয়োগে, ভাষা ব্যবহারে, বিষয় নির্বাচনে— প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের ব্যর্থতা প্রকট হয়ে উঠছে। কাদের জন্য, কি জন্য, কেন লিখছি— এটাও অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যাই। ভুলে যাই, কিংবা আমরা পেরেই উঠি না সেই কৌশলটা আয়ত্তে আনতে যে, কিভাবে লিখলে তাদের মন-মস্তিষ্ক স্পর্শ করা যায়, গড়ে তোলা যায় তাদেরকে সুন্দর মানুষ হিসেবে। কিন্তু এর চেয়েও বড় ব্যর্থতা হলো— এই দু'দশক পর্যন্ত লিখে এবং শত শত বই প্রকাশ করেও তাদেরকে আমরা গ্রন্থ পাঠের মানসিক তৃপ্তি দিতে পারিনি। সেটা পারলে, সন্দেহ নেই— 'গোপাল ভাঁড়' ছেড়ে তারা নিশ্চয়ই এই দিকে অনেক বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠতো। লেখার প্রতি আমাদের অনাদর এবং অদক্ষতাই সম্ভবত এই অনাকাঙ্ক্ষিত দূরবস্থার মূল কারণ। ছোটরা যদি একটি লেখা পাঠ করে আর একটির প্রতি লোভী দৃষ্টি না ফেলে, তাহলে বলাই বাহুল্য- সেই ব্যর্থতা কিশোরের নয়, লেখকের। বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত বলে মনে করি। সংখ্যাধিক্য কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো— ভাল লেখা।

আমাদের সন্তানদের হাতে আমরা এমন বই তুলে দিতে চাই, যে বই পেলে তারা নাওয়া-খাওয়া ভুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাবে, কিংবা হুমড়ি খেয়ে পড়বে প্রতিটি বর্ণের ওপর, প্রতিটি বিষয়ের ওপর মিষ্টিলোভী পিঁপড়ার মত। বইটি হতে হবে এমন বই, লেখাটি হতে হবে এমন লেখা— যা কাজ করবে ঠিক ঐ লাউ শাকের চারার মত— শিকড়ে পানি পেলে যে চারা লকলক করে বেড়ে ওঠে। কি সবুজ, কি তরতাজা, কি পরিপুষ্ট তার এক একটি লতাপাতা। তরতর করে বেড়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে আলো, পানি আর বিশুদ্ধ বাতাসের সাহায্যে। বড় হচ্ছে। তার জন্য তখন প্রয়োজন পড়ছে বিশাল মাচা বা ছাউনির। তারপর অবাক বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকবে পৃথিবীর দিকে। বলবে, হ্যাঁ এই পৃথিবী আমার। আমিই এর যোগ্য উত্তরাধিকার।

আমরা তো চাই তরতাজা প্রাণস্পন্দনে টইটুম্বুর তেমনি শিশু-কিশোর— যারা পুঁই কিংবা লাউ-এর মতই শুধু হবে না, কেউ কেউ হয়ে উঠবে বিশাল বট কিংবা শালবৃক্ষও।

কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরির দায়িত্বটি পালন করতে হবে এই আমাদেরকেই। বিষয়টি ভুলে গেলে চলবে না।

শিশু সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গ :

'শিশু সাহিত্য ও মানুষের কথা' শিরোনামে ম্যাক্সিম গোর্কি খুব চমৎকার কিছু কথা বলেছেন। তার মতে 'শিশুপাঠ্য গ্রন্থের ভাষাগত সমস্যাটি শিশুদের জন্য অনুসরণীয় সামাজিক শিক্ষার পন্থারই একটি সমস্যা। কথাটি অনস্বীকার্য।

শিশুদের কাছে অতীতের ঘটনাবলীর প্রক্রিয়াদির কথা তুলে ধরা প্রয়োজন।' এরপর শিশু সাহিত্য রচনাকারীদের উদ্দেশ্যে ম্যাক্সিম গোর্কির বক্তব্য হলো,"শিশু সাহিত্য রচনার সময় আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, নানাবিধ ঘটনা এবং প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে এবং এই বহু বিচিত্র প্রভাব কেবল মানুষের দৈনন্দিন জীবনেই লক্ষণীয় নয়; লক্ষণীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও, যেখানে তথাকথিত 'দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্যাবলী' প্রায়ই রক্ষণশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। তার ফল 'স্পষ্ট ব্যাপার'-এর কাছে চিন্তার দাসত্ব এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া আর স্বাধীনতাবোধ। 'সত্য' বস্তুত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞানের অবলম্বন এবং জ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সাময়িক বিরতির স্থান। কিন্তু এই অবলম্বন প্রায়ই তার 'উদ্ভাবক'-এর কাছে হয়ে ওঠে সচেতন বা সহজাত উদ্যমের অভিব্যক্তি। যার লক্ষ্য থাকে প্রশান্তি আর অন্যের মনের ওপর ক্ষমতা বিস্তারের দিকে। এই কারণেই সমালোচনা অগ্রাহ্য করে সত্যকে অনেক ক্ষেত্রেই তুলে ধরা হয় নির্বিকল্প এবং 'চিরন্তন নিয়ম' রূপে অথবা 'প্রত্যয়'-এর 'আকারে।'

ওপরের উদ্ধৃতিটুকু কেবল শিশু সাহিত্যিকদের জন্য। সুতরাং গোর্কির বক্তব্যের মর্মোদ্ধার করা তাদের পক্ষে কঠিন কিছু নয়।

ছোটদের জন্য যারা লেখেন, যাদেরকে আমরা শিশু সাহিত্যিক বলি, যারা আমাদের শিশুতোষ গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, জীবনী, ইতিহাস প্রভৃতি রচনা করেন, প্রশ্ন জাগে— তাদের সফলতা কিসের ওপর নির্ভর করে? এ প্রসঙ্গে খুব স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, প্রথমত প্রয়োজন আমাদের একদল প্রতিভাবান লেখকের। যাদের চিন্তা ও মনের পরিচ্ছন্নতা থাকবে। যারা হবেন সরল, সরস, বুদ্ধিদীপ্ত এবং

www.pathagar.org

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাভিসারী। যারা শিশু সাহিত্যের কলাকৌশলগুলো বোঝেন এবং এ ব্যাপারে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন। মূলত তারাই সফল ও সার্থক শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষমতা রাখেন। এছাড়া শিশু সাহিত্য বিকাশের জন্য প্রয়োজন উন্নতমানের শিশুতোষপত্রিকা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সম্পাদকের। এরপর যেটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা হলো শিশুতোষ গ্রন্থাবলী যথাসময়ে এবং যথাযথ, সুন্দরভাবে প্রকাশের নিশ্চয়তা বিধানের কারিগরী সুযোগ-সুবিধা থাকা। কিন্তু লেখকের যথাযথ পারিশ্রমিক বা সম্মাননার বিষয়টিকে গৌণভাবে বিচার করলে চলবে না। বরং কাগজ, কালি, প্লেট, ছাপা বা বাঁধাই খরচের মত লেখকের লেখার বা তার গ্রন্থের রয়ালিটির বিষয়টি সমান গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে সেটা পরিশোধের ব্যাপারে প্রকাশকদের আন্তরিক হতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে প্রায়শই লেখকের সম্মাননার বিষয়টি থেকে যায় প্রকাশক কিংবা পত্রিকা কর্তৃপক্ষের হিসাবের বাইরে। ভাল কাজের জন্য যথাযথ সম্মাননার বিষয়টি নিশ্চিত করা গেলে আমাদের দেশে শিশু সাহিত্য আরও বেশি সমৃদ্ধ হতো বলে মনে করি।

সাম্প্রতিক ছড়া; একটি প্রতিবাদী চিত্র

পৃথিবীর লক্ষ-কোটি শান্তিপ্রিয় মানুষ অবাক-বিস্ময়ে আর একবার প্রত্যক্ষ করলো এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক-যুদ্ধের বিরোধিতা করে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ ফুঁসে উঠেছিল সমগ্র বিশ্ব। সে ছিল এক অভাবনীয় দৃশ্য। এই দিনে রাজপথ কেঁপে উঠেছিল খোদ যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরাক-যুদ্ধে তার মিত্র বৃটেনসহ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার লাখো যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী মানুষের পদভারে।

যুক্তরাষ্ট্রের হিংস্র বুশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভমুখর এইসব মানুষের ঢল নামে বিশ্বের রাজপথে। প্রকম্পিত করে তোলে পৃথিবীর মাটি। স্মরণকালের এই বৃহত্তম যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে কেঁপে উঠেছে বুশ ও টনি ব্লেয়ারের রক্তলোভী মসনদ। সবচেয়ে বড় সমাবেশ ঘটে লন্ডনের হাইড পার্কে। এখানে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেয়। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জেসি জ্যাকসন, লন্ডনের মেয়র কেন লিভিংস্টোনের মতো ব্যক্তিরাও এই বিক্ষোভে অংশ নেন। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ ভবনের সামনে লক্ষাধিক মানুষ যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেয়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাসহ এশিয়ার সিউল, ব্যাংকক, হংকং, টোকিও , কুয়ালালামপুর, নয়াদিল্লী, করাচি,

রাওয়ালপিন্ডি, জাকার্তা, কাঠমান্ডু, ম্যানিলা, তাইপে, সিঙ্গাপুর, ইউরোপের প্যারিস, বার্লিন, রোম, মাদ্রিদ, এথেন্স, লুক্সেমবার্গ, ইস্তাম্বুল, আমস্টারডাম, ভিয়েনা, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পার্থ, হোবার্ট, ক্যানবেরা, মেলবোর্ন, ডারউইন, এডিলেড ও সিডনি, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন, সিরিয়ার দামেস্ক এবং বাগদাদসহ বিশ্বের ছয় শতাধিক শহরে এই শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো ঐ একই দিনে। 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' 'তেলের জন্য আর রক্ত নয়', 'বোমা নয় বুশকে ফেলো', 'যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ার শান্তির পথে আসো' প্রভৃতি শ্লোগান এবং বুশ-ব্লেয়ারের ব্যঙ্গ কার্টুন সংবলিত প্লেকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুনে মুখর হয়ে উঠেছিল বিক্ষোভকারীদের যুদ্ধবিরোধী শান্তিমিছিল।

বিক্ষোভের সময় প্রতিটি নগরীর রাস্তাঘাট জনস্রোতে অচল হয়ে পড়েছিল।

১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ থেকে শুরু করে এখনও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমেরিকার আগ্রাসন ও যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমেরিকা স্তম্ভিত। বুশ-ব্লেয়ার-এর খোদ ঘর দু'টি এখন বিক্ষোভের তাণ্ডবে নড়বড় করছে। তারপরও রক্তপিপাসু বুশ-ব্লেয়ারের হুঁশ ফেরেনি। বরং এখনো তারা গোঁয়ার ষাঁড়ের মতো কেবল হুঙ্কার ছেড়েই চলেছে। তবুও বিশ্বের লক্ষ লক্ষ শান্তিকামী মানুষের যুদ্ধবিরোধী এই বিক্ষোভে এটাই প্রমাণ করলো যে, পৃথিবীর মানুষ বস্তুত শান্তি চায়, চায় নিরাপত্তা ও নিরাপদ একটি আবাসস্থল।

আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বের লক্ষ-কোটি মানুষের এই ঐক্যবদ্ধ কণ্ঠই রুখে দিতে সক্ষম বুশ-ব্লেয়ারের যুদ্ধের আস্ফালন। এই যুদ্ধবিরোধী ঐতিহাসিক বিশ্ববিক্ষোভ যুগে যুগে সকল যুদ্ধবাজ স্বৈরাচারীর জন্য শিক্ষণীয় এক দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সারা বিশ্বের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও নিন্দার তুফানকে উপেক্ষা করে মানুষরূপী শয়তান বুশ গত ২০ মার্চ সকাল ৮.৪০টায় নির্লজ্জের মত ইরাকে আগ্রাসী আক্রমণ শুরু করে। ঈঙ্গ-মার্কিন এই হামলা আরও কতদূর সম্প্রসারিত হবে তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। তবে এর বিরুদ্ধে এখনও বিশ্বের কোটি মানুষ ঘৃণা ও বিরোধিতা করেই চলেছে।

এখন দেখা যাক, যুক্তরাষ্ট্র তথা বুশের এই আগ্রাসী থাবার বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লেখকরা কিভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধবিরোধী কবিতা তো আছেই, এর পাশাপাশি আছে ছড়াও। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু ছড়ার উদ্ধৃতির মাধ্যমে সেটা বুঝতে চেষ্টা করবো। তবে বলা জরুরি যে, এটুকুই সব নয়, বরং সারাংশ বা নমুনা মাত্র। ব্যাপক অর্থে, আমাদের ছড়াও যে আন্তর্জাতিক ও

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বব্যাপ্ত মানবতাকে ধারণ করতে সক্ষম, এবং সেটা করেই চলেছে তারই স্বাক্ষরবাহী এই পংক্তিগুলো। এখানে যে বাংলাদেশের সকল ছড়াকার কিংবা কবিকেই তুলে ধরা সম্ভব হলো, তা নয়। তবুও মনে করি, এই সসীমের মধ্যে লুকিয়ে আছে অসীমের চরিত্র।

এন্টি মিসাইল

খুব সম্প্রতি, ৬ মার্চ ২০০৩ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হলো মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, নূরুজ্জামান ফিরোজসহ কিছু উদ্যমী সচেতন তরুণের উদ্যোগে একটি ছড়া বুলেটিন 'এন্টি মিসাইল'। এখানে আছে চুয়ান্নটি যুদ্ধবিরোধী ছড়া। আর 'যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই' এই শ্লোগানের সাথে একমত হয়ে স্বাক্ষর করেছেন প্রায় তিনশো লেখক, কবি, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন পেশাজীবী বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি। এ থেকেই বুঝা যায় যে, যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের শান্তিকামী মানুষ কতটা সজাগ। বলছিলাম 'এন্টি মিসাইলে' প্রকাশিত ছড়ার কথা। ছড়ায় প্রতিবাদী চিত্রের কথা। আবদুল হালীম খাঁর মাত্র চারটি লাইন দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি লিখছেন:

"আমার এখন ইচ্ছে করে
যুদ্ধে যেতে,
রাশিয়া আর আমেরিকার
অস্ত্র খেতে।"

অপরদিকে কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ভাষ্য হলো :

"দোহাই দিয়ে সন্ত্রাসবাদের
মারছে মুসলমান
আসলে বুশ গাইছে কিন্তু
ক্রুসেডের গান।"

আর আসাদ বিন হাফিজ প্রশ্ন রেখেছেন এইভাবে :

"বিশ্ববিবেক জবাবটা দাও
জবাবটা দাও দেশবাসী
হামলাকারী মার্কিনী বুশ
নয় কি বিশ্ব সন্ত্রাসী?"

বুশ যে এখন বিশ্ব সন্ত্রাসী, সেটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে। আহমদ মতিউর রহমানের ছড়ায় তারই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে :

www.nagorikpathagar.org

"দুষ্ট পিতার দুষ্ট ছেলে
মরণ নেশার খেলা খেলে
সবাই হতবাক।
সবার ওপর মারবে তুড়ি
একাই করবে বাহাদুরি
বিশ্ব চুলোয় যাক।"

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী বলছেন :

"যুদ্ধ যারা বাধায় তারা ঘৃণ্য এবং ঘৃণ্য
এই জগতে চায়না যে কেউ দেখতে তাগো চিহ্ন
.....
যুদ্ধ যদি সত্যি বাধে বুশ-চক্রের জন্য,
বিশ্ববিবেক অমানুষ বলে করবে ওদের গণ্য?"

কিংবা আতিক হেলালের উচ্চারণ :

"বিশ্ব বিবেক নয় এখন আর
মুখ লুকানো শামুক
এমন সত্য বুঝেই এখন
বুশ প্রশাসন ঘামুক।"

বুশ 'ঘামলেই' শুধু সমস্যার সমাধান হবে না। বরং এর সমাধান হলো;

"বুশ-ব্লেয়ার নিপাত যাক
বিশ্ববাসী মুক্তি পাক।"

এজন্যই মসউদ-উশ-শাহীদের আহ্বান :

"পৃথিবীটা শান্তির
চাইনাতো যুদ্ধ,
সাহসী জেগে ওঠো,
করো তাকে রুদ্ধ।"

নূরুজ্জামান ফিরোজের উক্তিটিও চমৎকার :

"আফগানিস্তান দখল নিয়ে
ধরছে এবার ইরাক,
এন্টি মিসাইল ফিরে এবার
যুদ্ধদানব ফিরাক।"

www.nagorikpathagar.org

'এন্টি মিসাইলে' প্রকাশিত চুয়ান্নটি ছড়ার সবগুলো উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। তবে কয়েকটির মাধ্যমে আমরা এটাই বুঝাতে চাইছি যে, ছড়া এখন আর কেবল শিশু ঘুমানোর জন্য নয়, বরং তা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসাবেও উঠে আসছে। আমরা জানি, যখনই দেশে ও আন্তর্জাতিক বিশ্বে অশুভ তরঙ্গমালা দুলে উঠেছে তখনই আমাদের দেশের সচেতন কবি-ছড়াকার তাদের শাণিত ছড়ার তরবারি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। 'পল্টনের ছড়া' 'রুশদীবিরোধী ছড়া', 'ফারাক্কার ছড়া', 'বরাক বাঁশ', 'সময়ের ছড়া'সহ এরকম বহু দৃষ্টান্ত ও প্রতিনিধিত্বমূলক আগুনঝরা প্রতিবাদী ছড়া সংকলনের সাথে আমরা পরিচিত। ছড়ায় প্রতিবাদী চিত্রটি খুব বেশি করে উঠে এসেছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে। সেটা আরও বেগবান হয়েছে একাত্তর পরবর্তী সময়ে। আর আজকের দিনে বিরাট বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আমার বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে রচিত এইসব প্রতিবাদী ছড়া যদি ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয়া যেত, তাহলে এ থেকেও সুদূরপ্রসারী সফলতা অর্জন করা সম্ভব হত। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সেটা হচ্ছে না বিধায় আমাদের ছড়ার শক্তি ও সামর্থ্যের বিষয়ে বিশ্ববাসী অপরিচিতও অজ্ঞই রয়ে যাচ্ছে। সেটা করা সম্ভব হলে একটা বড় অর্জন আমাদের ছড়ার স্বীকৃতির নাগালে চলে আসতো। হতাশ নই, আশাবাদী যে, আজ না হলেও আগামীতে সেটা হয়তোবা সম্ভব হবে এবং আমাদের ছড়া-সাহিত্যের শক্তির সাথে বিশ্ববাসী পরিচিত হবে। এখন প্রয়োজন কেবল সফল ও সুদৃঢ় উদ্যোগের। আমরা প্রতীক্ষায় আছি।

বৈচিত্র্যে ভাস্বর বাংলা ছড়া

সত্যিই বৈচিত্র্যে ভাস্বর আমাদের বাংলা ছড়ার ভুবনটি। বহুরূপে, বহুভাবে, বর্ণবহুলে আমাদের ছড়ার বাগানটি তরতাজা ও পল্লবিত হয়ে উঠেছে। অগ্রজরা যেমন তাদের অভিজ্ঞতা ও চেতনার ভাণ্ডারটি উজাড় করে দিয়েছেন, তেমনি তাদের পাশাপাশি তরুণ, নবীন, এমন কি সদ্য কচি-কিশোররা তাদের সামর্থ্যের ঝুড়ি উপুড় করে দিয়েছেন। ফলে সকলের সমন্বিত মেধা ও শ্রমবাহী চেষ্টায় আমাদের ছড়ার জগৎ এখন আন্তর্জাতিকতার আকাশকেও স্পর্শ করতে সক্ষম। বলা জরুরি যে, যদি এই সব ছড়া থেকে বাছাই করে নির্বাচিত কোনো কালেকশন ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া যেত, তাহলে কতই না ভাল হতো। এতে করে একদিকে আমাদের শিশু সাহিত্য যেমন

www.pathagar.net

বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিত, অপরদিকে এই দেশটিও পেয়ে যেত ব্যাপক মর্যাদা ও গৌরব। ক্রিকেট, ফুটবলসহ খেলাধুলা যদি বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য সময়োপযোগী প্রচেষ্টা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়, তাহলে সাহিত্যের মত স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী একটি শক্তিশালী মাধ্যমকে বিশ্বের সাথে পরিচিত করে তোলার উদ্যোগ নেয়া যাবে না কেন? আমি তো মনে করি, আজ মিডিয়া বিপ্লবের যুগে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা খুবই সহজ ব্যাপার। শুধু প্রয়োজন সরকার ও দায়িত্বশীলদের একটু সচেতন প্রয়াসের।

একটি ব্যাপারে আমাদের আস্থা ও আত্মবিশ্বাস থাকা দরকার, তা হচ্ছে বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় আমাদের শিশু সাহিত্যের সার্বিক মান খারাপ নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই উন্নত। যে কোনো দেশের শিশুতোষ সাহিত্যের চেয়ে আমাদের দেশের শিশু সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতা, প্রকৃতি ও রূপ-সৌন্দর্য, বৈভব ও বৈচিত্র্য অনেক বেশি। যেহেতু গদ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরা সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়, সে কারণে এখানে কেবল আমাদের কিছু ছড়া বৈচিত্র্যের চিত্রই তুলে ধরা হলো। এটা নিতান্তই নমুনাস্বরূপ। সুতরাং এটাই সামগ্রিক নয়। সকলের লেখার উদ্ধৃতি তুলে ধরাও সম্ভবপর নয়। সেটা বাস্তবতারও প্রতিকূলে। ফলে যাদের লেখা এই অংশে তুলে ধরা হলো না, তাদের অভিযোগ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। তবে তারাও তাদের সৃষ্টির মহিমা অবশ্যই ধারণ করছে আমাদের সামগ্রিক বিবেচনায়। অতএব তারাও আছেন এই মূল্যায়নের অন্তর্দেশে।

সৈয়দ আলী আহসানের একটি বিখ্যাত শিশুতোষ কবিতা আছে। নাম 'দেশের জন্য'। এ এক অসাধারণ কবিতা বলে মনে করি। দেশের প্রতি তার কী যে দরদ, কী যে ভালোবাসা— সবই ফুটে উঠেছে এই কবিতাটির মাধ্যমে। একটু পরখ করে নেয়া যাক। তিনি লিখছেন :

"কখনও আকাশ— যেখানে অনেক হাসিখুশি ভরা তারা,
কখনও সাগর— যেখানে স্রোতের তরঙ্গ দিশেহারা।
কখনও পাহাড়— যেখানে পাথর চিরদিন জেগে থাকে।
কখনও বা মাঠ— যেখানে ফসল সবুজের ঢেউ আঁকে।
কখনও বা পাখি— শব্দ ছড়ায় গাছের পাতায় ডালে—
যে সব শব্দ অনেকে শুনেছে কোন এক দূরকালে।
সবকিছু নিয়ে আমাদের দেশ একটি সোনার ছবি,
যে দেশের কথা কবিতা ও গানে লিখেছে অনেক কবি।

www.nagorikpathagar.org

এ দেশকে আমি রাত্রে ও দিনে চিরকাল ভালবাসি,
সব মানুষের ইচ্ছার কাছে খুব যেন কাছে আসি।
শুধু ভালবাসা বন্যার মতো মনের রাজ্যে জাগে,
সকাল বিকাল কর্মের খেলা হাসি আর অনুরাগে।
এ দেশকে নিয়ে আমার গর্ব প্রত্যহ, চিরদিন
দেশের জন্য সব কিছু দিয়ে বাঁচব রাত্রিদিন।"

তার আর একটি ছড়া এখানে তুলে ধরার লোভ সংবরণ করা গেল না।

"মাটি পাথর ঠাণ্ডা করে,
রক্তজবা ভিজিয়ে দিয়ে,
গাছের পাতায় পানির ফোঁটা
বিছিয়ে রেখে
বৃষ্টি থামে।
শিথিল পায়ে চলতে গিয়ে
হোঁচট খাবার সম্ভাবনা।
ভেজা-মাটির নরম কাদায়
কেন্নো কেঁচোর আনাগোনা;
ঠকঠকিয়ে বুড়ো কাঁপে
ঠান্ডা বাতাস গায়ে লাগে।
ছেলেরা সব মজা পেয়ে
হট্টগোলে হঠাৎ নামে
বৃষ্টি থামে।
সন্ধ্যা যখন বুড়ির মতো
ঘোমটা দিয়ে সূর্য সরায়,
আকাশ ভরা মেঘের কালো
সময়টারে যখন হারায়,
বৃষ্টি থামে সেই অবেলায়।
বৃষ্টি থামে গানের মতো—
সুরের শুধু একটুকু রেশ
ঝিঁঝি পোকার গুনগুনানি;
বৃষ্টি থামে ঘুমের মতো
স্বপ্ন দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে

www.pathagar.org

ছায়ার ছবি হঠাৎ টানি
বৃষ্টি থামে অবাক মানি।"

ছড়া-কবিতায় কবি আল মাহমুদ একটি বহুল উচ্চারিত নাম। ছড়া-কবিতায় তিনি বরাবরই অসাধারণ। তার 'কৃষ্ণচূড়ার পাতার ফাঁকে' থেকে কয়েকটি চরণ তুলে ধরছি :

"ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ হাঁটতে হবে আর কতদূর?
ভোরের বাতাস মিলিয়ে গিয়ে ডাক দিয়েছে তপ্ত দুপুর।
বাঁকের পরে বাঁক ঘুরেছি পেরিয়ে এলাম শহীদ মিনার
মিছিল তবুও থামছে নাতো পার হবে কি নদীর কিনার?
.....
লোহুর নদী পার হয়ে ফের মিছিল এগোয় নতুন ধরন
স্বাধীনতার শহীদপ্রাণের নামগুলোকে করছি স্মরণ।
মাগফিরাতের মাঙছি দোয়া হাত তুলে ঐ মেঘের দেশে
তাঁর করুণা পড়ুক ঝরে দীপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশে।

কবি আবদুস সাত্তার। ভাবতেই অবাক লাগে, কি পরিচ্ছন্ন ছিল তার কাব্যিক চিন্তা! যেমন পরিচ্ছন্ন, তেমনি সাবলীল। ছোটদের বড়দের— সকলের জন্যই তার সেই কবিতা হয়ে উঠেছে সমান জরুরি। শেখার ও অনুপ্রেরণার কত কিছু উপাদান যে রয়ে গেছে তার মধ্যে! ভেতর-বাহির এমন পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত কবির সংখ্যা আমাদের সমাজে নেহায়েতই কম। আর তার সময়ের অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের কথা যদি স্মরণ করি— তাহলে তো হতবাকই মানতে হবে। তার সতীর্থ অন্যান্য কবিরা যখন লিখছেন ভোগবাদী কবিতা, বা তারা বস্তুতান্ত্রিক চিন্তায় বিভোর, তখন কবি আবদুস সাত্তার কি এক আকুতিভরা হৃদয় দিয়ে লিখছেন :

"যখন কোরান পড়ি, মনে হয় ডুবে যাই আমি,
পুণ্যের সমুদ্রে; আর যে সমুদ্রে অন্য কিছু নেই
অক্ষরের ঢেউ ছাড়া। এমন পবিত্র আর দামী।
বাণীর সমুদ্রে নেয়ে যদি আমি সুন্দরের সেই
ঘনিষ্ঠ জ্যোতির কাছে নিতে পারি এই আমাকেই
তবে কি থাকবো আর কোনোদিন পাপের আসামী?
পুণ্য যদি পুণ্য আনে, আলো সে তো আলোক পাবেই
এবং তখন হবে এই সত্তা দৃঢ় মুক্তিকামী।

www.nagorikpathagar.org

কোরান সমাপ্ত করে যখন পৃথিবী নিয়ে ভাবি
মনে হয় সবকিছু পবিত্র কোরানে বাঁধা আছে,
এবং সকল শিক্ষা রয়েছে এ কোরানের কাছে।
জ্ঞানের দরজা খোলে একমাত্র কোরানের চাবি।
এবং কোরান যদি করা হয় জীবন-পাথেয়,
সে জীবন থাকবে কি কোনো কালে কারো অবজ্ঞেয়?"

সন্দেহ নেই, কবি আবদুস সাত্তারের এই কবিতাটি শিশু-কিশোরসহ সকল বয়সীর জন্যই সমান শিক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মূলত এই ধরনের কবিতাই লিখতেন। উদাহরণ হিসাবে এখন তার অসংখ্য কবিতা থেকে মাত্র একটি কবিতা তুলে ধরেছি।

কবি আবুল হোসেন মিয়ার চেতনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে আমাদের প্রিয় স্বদেশের বিজয়গাঁথা :

"ভয় করি নাই শত্রুসেনা,
পয়সা দিয়ে নয়কো কেনা
জান দিয়েছি মান দিয়েছি
মাথা পেতে সব নিয়েছি
শান্তি যত পেলাম মিছে
হটিনি তো কভু পিছে।
একটি ছোট ফুলের লাগি
যুদ্ধ রাতে রইনু জাগি।
ন্যায়ের তরে পাইনু অভয়
তাই আমাদের আসলো বিজয়।"

কবি আল মুজাহিদীর ছড়ায় উঠে এসেছে আমাদের স্বাধীনতা এইভাবে :

"বাংলা আমার পাখ্ পাখালি
ময়না টিয়ার গানের ডালি
প্রাণের স্বর্ণলতা।
বাংলা এখন বান ডাকা এক
জল টলমল রক্ত সাগর
মূর্ত স্বাধীনতা"।

www.nagorikpathagar.org

আর মসউদ-উশ-শহীদের চোখে :

"আমার চোখে স্বাধীনতা
শান্তি-সুখে থাকা,
হাজার রঙের রঙ তুলিতে
স্বপ্নগুলো আঁকা।"

শিশু সাহিত্যিক সাজজাদ হোসাইন খান আমাদের এই সবুজ দেশটির চিত্র এঁকেছেন কিভাবে দেখা যাক :

"সোঁদামাটি পরিপাটি
শালিকের পবনে
রঙধনু উঁকি দেয়
আকাশের ভবনে।

.....

ফুল পাখি মাখামাখি
চোখ কাড়ে সবুজে
খরা-বানে ব্যথা হানে
ভালোবাসি তবু যে।"

মতিউর রহমান মল্লিকের ছড়ায় পাচ্ছি আবার অন্যরকম স্বাদ। তার সুদৃঢ় উচ্চারণ :

"নামবে আঁধার তাই বলে কি
আলোর আশা করবো না?
বিপদ-বাধায় পড়বো বলে
ন্যায়ের পথে লড়বো না?"

কবি আবদুল হালীম খাঁর দৃষ্টিতে :

"স্বদেশ আমার অনেক সুখের অনেক আশার সিন্ধু,
স্বদেশ আমার শরৎ ভোরের একটি শিশির বিন্দু।

কবি আসাদ বিন হাফিজের কণ্ঠে শুনছি অন্য এক গুঞ্জন :

"হেই জনতা, চাই একতা আজ মিলনের অক্ত
স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখা নয়তো হবে শক্ত।"

www.pathagar.org

আহমদ মতিউর রহমান মনে করেন :

"আজকে হাসি আজকে খুশি
আজ বিজয়ের দিন
সব শহীদের কাছে আমার
অনেক অনেক ঋণ।"

গোলাম মোহাম্মদের করুণ কণ্ঠস্বর এখনো আমাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে :

"যেখানে বাতিল নড়ে কেড়ে নেয় ঈদ
জান্নাত বেছে নেয় ঈদের শহীদ
যেখানে মিনার ভাঙে বসতে আগুন
সেখানে ঈদের রঙ লাল বহু গুণ।"

শরীফ আবদুল গোফরানের একটি চমৎকার উচ্চারণ :

"কত বিজয় এলো গেলো
বছর গেলো ঢের
আশায় আশায় মা যে থাকেন
আসবে খোকন ফের।"

ফারুক নওয়াজের কোমল অনুভূতির সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক :

"তুলো তুলো মেঘের ফাঁকে
উঠলো বাঁকা চাঁদ
চাঁদ না ওটা-হাসি, খুশি
সুখ বিলানো ফাঁদ।
দেখতে ওটা কান্তে যেন,
রূপোর তলোয়ার
এই পৃথিবীর কণ্ঠে যেন
চোখ ধাঁধানো হার।"

বুঝাই যাচ্ছে, তিনি ঈদের চাঁদকেই শনাক্ত করছেন। কিন্তু তার চূড়ান্ত কামনা হলো :

"মুছিয়ে দিতে আসলো ও-চাঁদ
মনের যত খেদ—

www.boiRboi.blogspot.com

থাকবে না আর ধনী-গরীব
মনের ভেদাভেদ।"

ফারুক হোসেনের ছড়ায় আবার অন্যরকম মজাটা উঠে এসেছে :

"আম্মু বলেন, 'তোকে দিয়ে হবে না, আর কিচ্ছু—
ফড়িং দেখে ভয় পেয়ে যাস ভাবিস ওট বিচ্ছু'।
খোকন বলে 'মাগো তোমার কথাই মেনে নিচ্ছি—
দেখতে তুমি পাও না বুঝি আমি যে খুব পিচ্চি।

.....

আর কটা দিন পরেই দেখো পুরবে তোমার ইচ্ছে—
তোমার ছেলের সাহস তোমার ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে।"

আবার 'নদী'ও আমাদের ছড়ায় উঠে এসেছে নানা বৈচিত্র্যে। যেমন :

"কপোতাক্ষ কপোতাক্ষ, কী যে মধুর ডাক!
মায়ের কেশের মতোই সে যে নিচ্ছে শত বাঁক।
ওই যে নদী-আমার নদী, কোথায় বা তার ঘর?
সে যে আমার বুকের ভেতর নিত্য সহচর।"

কিংবা—

"নদীর বুকে শান্ত বিকেল
নিকেল করা জল,
বাতাস ফুঁড়ে উড়ছে পাখি
উড়ছে বকের দল।"

নাসির হেলালের ইচ্ছাটা এই রকম :

"চাঁদের ঝিলিক মনের মাঝে
আনে খুশির জোয়ার
ঈদের দিনে পরে সবাই
খোলা সবার দুয়ার।"

আহমদ সাকী 'তোমার স্মৃতি' এঁকেছেন বেশ চমৎকারভাবে :

"নীল আকাশের বুক চিরে মা
বিষ্টি যখন নামে,
খুঁজি মাগো তোমার ছবি
মনেরই এলবামে।

www.nagorikpathagar.org

টিনের চালে গাছের ডালে
বিষ্টি যখন ঝরে,
কেবলই মা তোমার কথা
আমার মনে পড়ে।"

ইকবাল করিম রিপনের কণ্ঠে অন্যরকম আর এক ধ্বনি :

"ভোরের বেলায় বিজন পথে
একলা যখন চলি
গাছ গাছালির সাথে তখন
অনেক কথাই বলি।"

আবদুল কুদ্দুস ফরিদীর অনুভূতি হলো :

"যুদ্ধ হলে ধ্বংস হবে দেশ
হাজার হাজার প্রাণের হবে ক্ষয়,
ধ্বংস হবে শান্ত পরিবেশ
যুদ্ধবাজের হবেই পরাজয়।"

আমাদের শিশু সাহিত্যে এসেছে অনেক বৈচিত্র্য। এখানে আরও কয়েকটি নমুনা-উদ্ধৃতি তুলে ধরছি।

নূরুজ্জামান ফিরোজ 'ঈদের ছড়ায়' লিখছেন :

"আনন্দ আজ কেমনে হবে
দুঃখীজনের সামনেই,
অসমান এই সমাজে আজ
ঈদের খুশির দাম নেই।"

মানসুর মুজাম্মিল 'হারিয়ে যাবার দিন'-এ বলছেন :

"আকাশ আমায় নাও তুলে নাও
তোমার নীলের মাঝে
আমি যেন থাকি রত
নীল বানানোর কাজে।"

আলতাফ হোসাইন রানা 'রাঙা ভোরে' মনে করেন :

"আঁধার কেটে ভোর হবে যে
সবাই জানে,

ফুলের শোভা উঠবে মেতে
পাখির গানে।"

জাকির আবু জাফরের সুদৃঢ় উচ্চারণ হলো :

"নিজের জীবন গড়তে পারো যদি
বুকের ভিতর বইবে আলোর নদী।
শান্তি সুখে ভরবে তোমার ঘর
সবাই হবে আপন তোমার
থাকবে না কেউ পর।"

জামান সৈয়দী 'নীল আকাশে নীলের মাসে' কেবলই কামনা করেন :

"ভোরের বাতাস চাঁদের আলো
যার দয়াতে পাওয়া
তারই কাছে হয় যেন আজ
সকল কিছু চাওয়া।"

ওমর বিশ্বাসের অনুভূতিটাও বেশ মজার :

"শীত সকালে শিশিরগুলো
ঝরে পড়ে ঝুরঝুরে
মুক্তোদানায় ঈদের আমেজ
তোমার আমার
সব মানুষের মন মেজাজও ফুরফুরে।'

'আমার দেশ'-এর একটি বর্ণবহুল চিত্র এখানে তুলে ধরার প্রয়োজন বোধ করছি। দেখে নেয়া যাক আমার দেশের শোভাটি কেমন :

"মাঠের পরে মাঠ চলেছে বিলের পরে বিল,
ধানের ক্ষেতে বাতাস নাচে নীল আকাশে চিল।
নদীর বুকে পালের নাও
এসব রেখে কোথায় যাও?
একটু থামো এই এখানে বাঁক ফেরানো ঘাটে,
এই দেখো না খেলার সাথী বকের সারি হাঁটে।
পুবের মাঠে কাওন আছে
মটরশুঁটি বাদাম আছে
ঘাসের বুকে ঘুমায় যাদু শিশির ভেজা খাটে।

www.pathagar.com

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
তার চেয়ে যে অনেক খাঁটি—
দুধের বাঁটি উপচে পড়া শস্য-শ্যামল দেশ,
সাতটি রঙে বাঁধা আমার সোনার বাংলাদেশ।"

আমার দেশটি এমন হলেও বিশ্বপরিস্থিতির অবস্থা কিন্তু ভিন্ন। সেটা কেমন? জানা যাক কয়েকটি চরণের মাধ্যমে :

"ভূ-গোলকে ভূতের ছায়া দু'পাশে তার ক্ষত
বিশ্বটাকে শিলায় ফেলে পিষছে অবিরত।
পৃথিবীটা তপ্ত কড়াই কামারশালার ভাপ
ভূ-গোলকের পেটের ভেতর কাল কেউটে সাপ।
.....
দানবগুলো পিষছে মানুষ হাতীর মতো পায়ে
ভাঙছে হাজার নগর-বাড়ি বুলেট বোমার ঘায়ে।
ভয়ে থর্ থর্ বিশ্ব এখন নিঝুম কবরপুরি
ঘুমের ঘরে ডাকাত হাঁটে, চোখের ভেতর ছুরি।"

আশার কথা হলো, আজকের দিনেও যারা লেখার জগতে আসছেন, সেই আনকোরা নতুন লেখকদের মধ্যে বোধ ও চেতনার এক ধরনের পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 'ননসেন্স রাইমসের' দিকে আজ আর কারোর দৃষ্টি নেই। বরং 'সময়' নামক 'চাবুকটি' তাদেরকে সচেতন করে তুলেছে। শুধু নান্দনিকতা নয়, এখন প্রয়োজন দায়িত্ববোধের পূর্ণ জাগরণ। সেটাই লক্ষ্য করা যাচ্ছে আজকের সামগ্রিক শিশু সাহিত্যে। এটা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই শ্লাঘার বিষয়। নানা স্রোতে, নানা বৈচিত্র্যে বয়ে চলেছে আমাদের ছড়া-কবিতা। কখনো শিশুতোষ, কখনো কিশোরতোষ, আবার কখনো বা সেই লেখা হয়ে উঠেছে সকল বয়সী পাঠকের উপাদান।

আমাদের ছড়া-কবিতায় যেমন টেকনিকের পালাবদল ঘটেছে, তেমনি বিষয়-বৈচিত্র্যেও এসেছে নতুনত্ব। বিজ্ঞান, অত্যাধুনিক টেকনোলজি, আধুনিকতা, মারণাস্ত্র, সমরাস্ত্র, যুদ্ধ এমনকি 'এডিস মশা' পর্যন্ত সাবলীল গতিতে উঠে এসেছে। আজকের দিনের একেবারে নতুন, বলতে গেলে শিশু–তাদের কচিমনে এ ধরনের বিষয়গুলো কিভাবে দাগ কেটেছে, তাদের দু-একটি লেখা থেকেই

www.nagorikpathagar.org

তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যাক। হতে পারে কচিহাতের লেখা, কিন্তু মনে করি আমাদের ছড়ার সার্বিক অবয়বে তাদের কচি হাতের বর্ণছটার কারুকাজ নেহায়েত ফেলনা নয়। যেমন 'এডিস মশা' নিয়ে নাওশিন মুশতারী নামক এক ক্ষুদে লেখকের একটি ছড়া এরকম :

"এই দেশের একটি মশা
নাম তার এডিস,
তার ভয়ে কাঁপে দেশ
পুরুষ কিংবা লেডিস।
এমন মশা
যায় না বসা
বাইরে কিংবা ঘরে,
একটু কামড় দিলেই শরীর
কাঁপতে থাকে জ্বরে।"

আবার তার মতেই আর একজন— মুহম্মদ শাহ আলম 'নতুন বছর'-এ তার ভাবনাটি তুলে ধরছে এইভাবে :

"যাদের ঘরে দুঃখ শুধু
তাদের ঘরে এবার যেন
সুখের গোলাপ ফোটে।"

মাহমুদ শরীফের প্রত্যাশাটাও দারুণ :

"আমরা ছাত্র জ্ঞানের পাত্র
সন্দেহ নেই তাতে
আগামীতে দেশের ভার
আসবে মোদের হাতে।"

সত্য বলতে আমাদের স্বপ্ন এবং প্রত্যাশাও তাই।

'নতুন দিনে' কাজী আফতাব উদ্দীনের ইচ্ছাটুকুর সাথে একটু পরিচিত হওয়া যাক :

"নতুবা বছর নতুন বছর
নতুন দিনের ছেলে,
ন্যায়ের পথে গড়বো জীবন
সূর্য দেবো মেলে।

www.nagorikpathagar.org

অনাহারে অর্ধাহারে
বন্ধু যারা আছে,
জানবো সবার কুশলাদি
গিয়ে তাদের কাছে।"

আবারও স্মরণযোগ্য যে, এই চারটি উদ্ধৃত ছড়ার লেখক একেবারেই নতুন। বয়সেও নবীন। হাতও কচি। তারপরও লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, এদের এই কচি মনেও কি ধরনের চিন্তার ঝরণাধারা বয়ে গেছে। বলা জরুরি যে, সাম্প্রতিক বাংলা ছড়া-কবিতায় এভাবেই উঠে এসেছে অজস্র মণি-মুক্তা। এরা পূর্ণতা পেলে আমাদের ছড়া সাহিত্য যে আরও পূর্ণতায় ভাস্বর হয়ে উঠবে, সেটা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশের প্রবীণ, তরুণ, নবীন এবং একেবারে কচি-কাঁচারা পর্যন্ত আমাদের এই প্রত্যাশা ও স্বপ্নকে ক্রমাগত জাগিয়ে তুলছে। এটা নিশ্চয়ই আশা ও সুখের কথা।

সব মিলিয়ে এই হলো আমাদের ছড়ার দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা-জারিত রূপ-ব্যঞ্জনার একটি খণ্ডচিত্র। বিকাশ ও বৈভবে আমাদের ছড়ার রয়েছে সুদূরপ্রসারী শক্তির এক অসামান্য সম্ভাবনা। এখন প্রয়োজন কেবল জাগ্রত ও সুপ্ত প্রতিভার যথাযথ লালন।

পত্র-পত্রিকার ভূমিকা

সন্দেহ নেই, কেবলমাত্র শিশু-কিশোর সাহিত্য কেন, পুরো সাহিত্য বিকাশে পত্র-পত্রিকার ভূমিকাই মুখ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমাদের দেশে যে হারে লেখক বাড়ছে, সেই হারে লেখার উপযোগী পত্র-পত্রিকা বাড়ছে না। এমন কি এক সময় যে ধরনের উন্নতমানের শিশু-কিশোর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো, আজ তার সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে।

দৈনিকের প্রতিটি কাগজের সপ্তাহে একটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকে শিশু সাহিত্যের জন্য। কিন্তু সেই পৃষ্ঠাটি যারা সম্পাদনা করেন, এর পেছনে তাদের না থাকে কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য, না থাকে কোনো যত্ন ও পরিচর্যার ছাপ। সুসম্পাদনার তো প্রশ্নই ওঠে না। কোনো রকম দায়সারাভাবে পৃষ্ঠাটি বার করতে হয়, তাই করেন। ফলে দৈনিকের শিশুদের পাতায় কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখকের ভালো লেখা আজকাল প্রায় চোখেই পড়ে না। পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কিংবা পৃষ্ঠাটির দায়িত্বশীল ব্যক্তিদেরও তেমন কোনো দরদ বা গরজ আছে বলে মনে হয় না। বরং হাতের কাছে যা পান, পৃষ্ঠা ভরার জন্য তাই ছাপেন। ছাপেন বটে, কিন্তু এই অসম্পাদিত

www.nagorikpathagar.org

অসুন্দর বিশৃঙ্খল পৃষ্ঠাটি এতই নিম্নমানের হয়, যা পাঠেরও অযোগ্য হয়ে পড়ে। সত্যি বলতে, আজকের কোনো দৈনিকের শিশুদের পাতাটি আর লেখক ও পাঠককে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হচ্ছে না। এমনকি এই পৃষ্ঠাটির ব্যাপারে তাদের কোনো উৎসাহ বা আগ্রহও লক্ষ্য করা যায় না। না লেখার ব্যাপারে, না পাঠের ক্ষেত্রে। যদি এই পৃষ্ঠাটির প্রতি একটু যত্ন নেয়া যেত, তাহলে বোধ করি আমাদের ক্ষুদে ও উঠতি লেখকদের জন্য এটাই হতে পারতো বেড়ে ওঠার একটি আদর্শ ও চমৎকার মাধ্যম। শুধুমাত্র হেলাফেলা ও দায়িত্বহীনতার জন্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকার জন্য, আন্তরিকতাও দরদহীনতার জন্য এতবড় একটি মাধ্যমও শিশু সাহিত্য বিকাশে তেমন কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছে না। দিতে পারছে না নতুন লেখকদের কোনো দিক-নির্দেশনা। যদি প্রতিটি দৈনিকের শিশু সাহিত্যের পাতাটি সুসম্পাদিত, দিক-নির্দেশনামূলক সম্পাদকীয় এবং প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখার পাশাপাশি ছোটদের লেখা প্রকাশিত হতো, তাহলে বোধ করি দৈনিক পত্রিকাগুলো শিশু সাহিত্য বিকাশে একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করতে পারতো। আফসোস জাগে,কেবল তাদের অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার কারণে আমরা সেই সোনালি ফসল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা

বাংলাদেশে কখনই প্রচুর পরিমাণে শিশু-কিশোর মাসিক পত্রিকা ছিল না। প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল বটে; কিন্তু ব্যাপ্তিতে, সুসম্পাদনায় প্রায় সবগুলোই ছিল উৎকৃষ্টমানের। এক সময় বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'ধান শালিকের দেশ', শিশু একাডেমী থেকে প্রকাশিত মাসিক 'শিশু', চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে 'নবারুণ' খুব সযত্নে সম্পাদিত হয়ে নিয়মিত প্রতি মাসে প্রকাশিত হতো। দেশের প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত লেখকের পাশাপাশি নতুন লেখকদের লেখাও যত্নের সাথে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হতো। শুধু শহর কেন্দ্রিক নয়, এই পত্রিকাগুলোর বিচরণ ছিল মফস্বল শহর থেকে গ্রাম পর্যন্তও। পত্রিকাগুলো পাঠক ও লেখকদেরকে সমানভাবে আন্দোলিত ও আপ্লুত করতে সক্ষম ছিল। কিন্তু কালে কালে অবস্থা এতই নাজুক হয়ে উঠেছে যে, আমাদের দেশ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, প্রযুক্তি যতোটা এগিয়ে গেছে, ততোটাই পিছিয়ে পড়েছে সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাগুলো। প্রতিমাসে নিয়মিত প্রকাশনা ছাড়া কোনো মাসিক পত্রিকারই স্বাস্থ্যল বিচরণ সম্ভব নয়। পত্রিকা তিনটির জন্য আমাদের কষ্ট হয়। কি কারণে জানি না, প্রতি মাসে নিয়মিত প্রকাশনার ধারায় প্রায়ই ছেদ পড়ে। মাঝে মাঝে এদের দীর্ঘ বিরতি

বিলুপ্তিতে রূপ নেয়। এটা পীড়াদায়ক তো বটেই, অস্বস্তিকরও। তার ওপর পত্রিকাগুলির সহজলভ্যতার অভাব। চিড়িয়াখানা কিংবা যাদুঘরে গিয়ে দেখার মত অবস্থা। মফস্বল শহর তো দূরে থাক, খোদ ঢাকা শহরের পত্রিকার স্টল কিংবা হকারদের হাতেও দেখা যায় না। তবুও যদিও বা দু'একজন ভালো লেখক খোঁজ-খবর নিয়ে এসব পত্রিকায় লেখেন, তাদেরও পোহাতে হয় কপি ও লেখক সম্মানী পাওয়ার ব্যাপারে সীমাহীন দুর্ভোগ। ফলে স্বত:স্ফূর্তভাবে কোনো ভালো-ভদ্র লেখকই এসব পত্রিকায় লিখতে স্বস্তিবোধ করেন না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশের এই তিনটি পত্রিকায় যখন এমন বেহাল অবস্থা, তখন কে আর একসময়ের শাহেদ আলী সম্পাদিত সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'সবুজ পাতার' কথা মনে রাখবে? বলা বাহুল্য সরকারের প্রত্যক্ষ খরচে আজ যে 'সবুজ পাতা' প্রকাশিত হচ্ছে, প্রকৃত অর্থে সেখানে 'সবুজ' নেই, 'পাতা'ও নেই। কি এক ছাল-বাকলহীন, পাতাপল্লবহীন মরা জিবলীর কাণ্ড। সঙ্গত কারণে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রকাশিত এই সরকারি পত্রিকাটিও এখন আর লেখক-পাঠকদের হৃদয়ে কোনো আবেগের বুদবুদ তুলতে পারছে না।

যত সময় যাচ্ছে, ততোই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, সরকার নিয়ন্ত্রিত শিশু-কিশোর পত্রিকাগুলো ক্রমশ ডাইনোসরের মত অবলুপ্ত হতে চলেছে। এখন বাকি কেবল যাদুঘরের দৃশ্যমান বস্তুতে পরিণত হওয়া। এর পেছনে দায়ী সম্ভবত দেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, ক্ষমতার পালাবদল এবং সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন। একটি লজ্জাজনক উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বুঝাতে একটু চেষ্টা করি। যেমন– ১৯৯৬ সালে যখন আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলো, তখন সাথে সাথেই বদলে গেল ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'অগ্রপথিক' ও 'সবুজ পাতা'র চেহারা। আওয়ামী দুঃশাসনের পাঁচটি বছর এই দুটো পত্রিকাও যেন 'পল্টনের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। প্রতিটি সংখ্যায় শেখ পরিবারের বন্দনা, স্বপ্ন, আর স্তুতি। তাদের ওপর নিয়মিত ঢাউস সাইজের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারেও উৎসাহের কোনো কমতি ছিল না। ফলে পত্রিকা দুটি জাতীয় দায়িত্ব পালনের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের দলীয় পত্রিকায় রূপ লাভ করলো। আর তার চেহারা এমন বদহাল হলো যে, সেদিকে তাকাতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হতো। প্রশ্ন জাগে, এই যখন পত্রিকার দশা, তখন সেই পত্রিকা দেশের সঠিক সাহিত্য বিকাশে কি কোনো ভূমিকা বা অবদান রাখতে পারে? কোনো লেখকই কি এ ধরনের দলীয় মুখপত্রে লিখতে আগ্রহী হন?

www.pathagar.org

সঙ্গত কারণে একটি ব্যাধির কথা উল্লেখের দাবি রাখে বটে। সেটা হলো, আজকের দিনে প্রকাশিত কোনো পত্রিকাই যেমন নিরপেক্ষ নয়, বরং দলীয় মতবাদনির্ভর, তেমনি লেখকদেরকেও করা হয়ছে দলীয় ও মেরুকরণ। আজ আর কাউকে শিখিয়ে কিংবা বুঝিয়ে দিতে হয় না যে, কোন্ পত্রিকা বা কোন্ লেখক কোন দলের। পত্রিকা এবং তার লেখা দেখলে সহজেই এটা বুঝা যায় যে, কোন লেখক কোন্ দলের বা মতের। তবে সর্বত্রগামী যে কেউ নেই, তা নয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যারা সর্বত্রগামী— তাদেরকে আজ শনাক্ত করা হয় চরিত্রহীন হিসাবে। যদিও এটা ক্ষতিকর, তবে চলমান রাজনীতির ঘেরাটোপের প্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে অনেকটা প্রয়োজনও বটে। কেননা, যেদেশে ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন ইতঃপূর্বে কোনো রাজনৈতিক দলের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হয়নি, এবার ২০০৩ সালে সেটাও হলো। এখন বিয়ে-শাদী, আত্মীয়তা, বন্ধু-বান্ধব নির্বাচন, দাওয়াত, জানাজাও দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও দলীয়ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখন কেবল বাকি আছে মসজিদ। আল্লাহ না করুন, এই পবিত্র জায়গাটুকুও কবে না জানি দলীয় হয়ে ওঠে। শিয়া মসজিদ যেমন আছে, মেনি 'আওয়ামী মসজিদও' যে কখনো হবে না, এদেশে- হলফ করে বলা মুশকিল। বস্তুত রাজনৈতিক করালগ্রাস এদেশে এতটাই প্রবল যে, এখানে 'নিরপেক্ষ' থাকার কোনো সুযোগই নেই। সুতরাং আজকের দিনে পত্রিকা বা পত্রিকার লেখা দেখেই যে চেনা যায়— এটা ভালো নাকি মন্দ, সে বিতর্ক বা বিশ্লেষণে না গিয়ে বলা যায়, এটা এক দিক দিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন যে যতই সর্বত্রগামী হতে ইচ্ছুক হোন না কেন, ততোই সে অবিশ্বাসী, সন্দেহযুক্ত, হাস্যকর, কৌতূহল উদ্দীপক চরিত্রের লেখক হিসাবে সাধারণের কাছে পরিগণিত হচ্ছেন। এ ধরনের চরিত্রহীন লেখকের সংখ্যা নেহায়েত কম বলে রক্ষা, তা না হলে এই দুষ্ট ক্ষতে উঠতি লেখকরাও সংক্রমিত হয়ে উঠতো।

এ ধরনের এক জটিল পরিবেশের মধ্যে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হাতেগোণা কয়েকটি মাসিক শিশু-কিশোর পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– কিশোর কণ্ঠ, ফুলকুঁড়ি ও টইটুম্বুর প্রভৃতি। আশার কথা, সরকার নিয়ন্ত্রিত নয় বলেই এই পত্রিকাগুলো আমলাতান্ত্রিক জটিলতার শিকারে পরিণত হয়ে যানজটে আক্রান্ত হচ্ছে না। নিয়মিত পত্রিকাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিকটা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না বটে, কিন্তু আশার কথা, এই পত্রিকাগুলো শত বাধার পর্বত টপকে নিয়মিত

www.pathagar.org

প্রকাশনার ধারা অব্যাহত রেখেছে। হীন রাজনৈতিক বা চরিত্রহীন, আদর্শহীন কোনো বৈষয়িক স্বার্থ এর পেছনে কাজ না করায় পত্রিকাগুলোর গতি শ্লথ নয়; বরং দিনদিন বেগবান হচ্ছে। আমাদের দেশের শিশু সাহিত্য বিকাশে এবং নতুন লেখক সৃষ্টিতে এই পত্রিকাগুলোর গুরুত্ব ও অবদান সীমাহীন বলে মনে করি। লক্ষণীয় বিষয় বটে, এই তিনটি পত্রিকা আমাদের দেশের খ্যাতিমান লেখকদেরকে যেমন সন্নিবেশিত করতে পারছে, তেমনি একেবারে নতুন লেখকদের প্রতিভা বিকাশেও রেখে যাচ্ছে অনন্য ভূমিকা।

আমাদের জাতীয় চেতনা, আদর্শ ঐতিহ্য সম্পর্কেও পত্রিকাগুলো সচেতন। কিশোর কণ্ঠ ও ফুলকুঁড়ির মাধ্যমে একটি মৌল সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করা এবং তার আলোকে এগিয়ে চলা— এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বলে মনে করি। কারণ যে কোনো কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির না হলে সেটা সফলতার দিকে ধাবিত হতে পারে না। মুখ থুবড়ে পড়ে যায় সামান্য হোঁচটে। এর প্রমাণ রয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিগত বহু শিশুতোষ পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে। সেগুলো এখন অবলুপ্ত। অনেক পত্রিকার নামও আজ আর কেউ স্মরণে রাখেনি। কিন্তু কিশোর কণ্ঠ ও ফুলকুঁড়ি ব্যতিক্রমী এক দৃষ্টান্ত বলে মনে করি। এই পত্রিকা দুটি যেমন তার প্রকাশনার ধারা শত সংকটের মধ্যেও অব্যাহত রেখেছে, তেমনি আমাদের শিশু-কিশোরদের মানসিক, চারিত্রিক, আদর্শিক, নৈতিক ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে এক অসামান্য ভূমিকা রেখে চলেছে। বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য বিকাশে ও সম্প্রসারণে এ দুটি পত্রিকার অবদান মনে করি সন্দেহাতীতভাবে উজ্জ্বল। কিশোর কণ্ঠ-এর কথা একটু পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে বৈকি!

কিশোর কণ্ঠ

আমরা বিস্ময় এবং আনন্দের সাথে লক্ষ্য করছি যে, কিশোর কণ্ঠ আজ আর শুধুমাত্র একটি পত্রিকার নাম নয়, সেটি একটি বৃহৎ জাতীয় আদর্শ-ঐতিহ্যের মুখপত্র এবং একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানে রূপ লাভ করেছে। সংখ্যা ও প্রচারের দিক দিয়ে বাংলাদেশের মাসিক পত্রিকার জগতে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করছে এখন কিশোর কণ্ঠ। এর সার্কুলেশন সংখ্যা বাংলাদেশের যে কোনো সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক এমনকি অনেক দৈনিকের চেয়ে বহু গুণে বেশি। শুধু শহরকেন্দ্রিক নয়, শহরের বাইরে মফস্বলের বাজার, গ্রাম এমন কি পাড়া বা মহল্লায় পর্যন্ত কিশোর কণ্ঠের বিস্তৃতি এবং বিচরণ। এটা এদেশের জন্য এক ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত বলে মনে করি।

www.pathagar.org

এছাড়া কিশোর কণ্ঠ লেখক সম্মেলন ও সাহিত্য পুরস্কারের আয়োজনের মাধ্যমে আর একটি চূড়াস্পর্শী ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমাদের জানা মতে, ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কোনো শিশুতোষ পত্রিকার উদ্যোগে এ ধরনের জাতীয় কার্যক্রম ইতঃপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিনি। এমন কি সরকারি ব্যবস্থাপনায় যে কটি শিশুতোষ পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তারাও সাহস করে এগিয়ে আসেনি। যেটা এ পর্যন্ত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সরকার পারেনি, সেই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দায়িত্বটি পালন করছে কিশোর কণ্ঠের মতো একটি পত্রিকা। সুতরাং কিশোর কণ্ঠের এই অনন্য-অসাধারণ ভূমিকা নিশ্চয়ই এদেশের শিশু সাহিত্য বিকাশের ধারায় স্থায়ী আসন করে নেবে। এটা যে বাংলা সাহিত্য ও পত্রিকার ইতিহাসে একটি গৌরবজনক অধ্যায়ের সূচনা করছে— এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। কিশোর কণ্ঠ ডিজিটাল ম্যাগাজিনে রূপ লাভ আর একটি নতুন দরোজা উন্মুক্ত করলো আমাদের শিশু সাহিত্যে। এটাও একটি ব্যতিক্রমী সময়োপযোগী উদ্যোগ। কিশোর কণ্ঠের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে দুটো অসামান্য সংকলন— উপন্যাস ও গল্পসমগ্র। বাংলাদেশের ইতিহাসে যা সম্পূর্ণ নতুন এক সংযোজন। আগেই বলেছি, কিশোর কণ্ঠ এখন আর কেবল একটি শিশুতোষ পত্রিকার নামই নয়, সেটা পরিণত হয়েছে একটি যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠানে। এখন এর ধারাবাহিকতা, বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং গতিশীলতার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকলে, সযত্ন আন্তরিক প্রচেষ্টা বহমান রাখলে আশা করা যায়, আল্লাহর রহমতে কিশোর কণ্ঠ একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এদেশের শিশু সাহিত্য বিকাশে জাতীয় ইতিহাসে সীমাহীন অবদান রাখতে সক্ষম হবে। গত ১৩ মার্চ কিশোর কণ্ঠ পাঠক ফোরামের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ-বিরোধী সমাবেশ ও মিছিল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুদ্ধবাজ বুশের বিরুদ্ধে এদিন শতশত শিশু-কিশোরের প্রতিবাদী পদভারে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঢাকার বায়তুল মোকাররমসহ পল্টনের রাজপথ। কিশোর কণ্ঠের এটাও একটি ব্যতিক্রমী শনাক্তযোগ্য সফলতা বলে মনে করি। আমরা এভাবেই কিশোর কণ্ঠের অগ্রযাত্রার কামনা করছি।

লিটল ম্যাগাজিন

সার্বিক সাহিত্য বিকাশের জন্য লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দৈনিক কিংবা মাসিক পত্র-পত্রিকার সাহিত্য, কিংবা শিশুতোষ পাতায় স্থান করে নেয়া খুব সহজ কাজ নয়। ক্রমাগত লিখে নিজেকে সেভাবে প্রস্তুত করে তারপর ঐ পর্যন্ত পৌঁছানো যায়। এ ক্ষেত্রে লিটল ম্যাগাজিন সহায়ক ভূমিকা পালন

www.nagorikpathagar.org

করে। কিছু উদ্যমী ও উৎসাহী তরুণের প্রচেষ্টায় লিটল ম্যাগাজিন সাধারণত প্রকাশিত হয়ে থাকে। যেখানে নতুন লিখিয়েরা সহজেই জায়গা করে নিতে পারে। এভাবে ক্রমাগত লেখা ও প্রকাশনার ফলে ক্ষুদে লেখকদের মধ্যে এক সময় আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে। লেখার হাতও মজবুত হয়।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাহিত্যের অপরিহার্য এই অংশ— লিটল ম্যাগাজিন এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। তথ্য-প্রযুক্তিগত সুবিধা থাকলেও লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনায় যে ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রয়োজন হয়,সার্বিক অর্থে সেটা পাওয়া না যাওয়ার কারণেই মূলত এই করুণ দশার সৃষ্টি। একসময় লিটল ম্যাগে সরকারি বিজ্ঞাপনও পাওয়া যেত। এখন আর সেই সুযোগ নেই। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতেন, কিন্তু আজ সেটা বন্ধ। সকলের দৃষ্টি এখন চাকচিক্যময় বাণিজ্যের দিকে। সুতরাং অসহযোগিতা আর মুখ ফিরিয়ে নেবার ফলে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা আজ বন্ধের পথে। প্রয়োজন ছিল প্রতিটি মহল্লায় একটি করে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনার। তাহলে এরমধ্য দিয়েই হয়তোবা একদিন বেরিয়ে আসতো বড় কোনো লেখক বা কবি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেটা হচ্ছে না কেবল প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে। লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনায় খুব বেশি খরচ হয় না বটে, কিন্তু যেটুকু হয়, তা বহন করার মত শক্তি ও সামর্থ্য থাকে না উদ্যোগী তরুণদের।

এক সময় বেশকিছু লিটল ম্যাগাজিন বাংলাদেশে তুমুল আলোড়ন তুলেছিল। বনেদির খাতায় নামও উঠেছিল। তখন সবার আন্তরিকতা ও সহযোগিতা সহজলভ্য ছিল। সেই সব লিটল ম্যাগাজিন থেকে উঠে এসেছেন আজকের অনেক বিখ্যাত লেখক, শিশু সাহিত্যিক। কিন্তু আজকের দৃশ্য ভিন্ন। এখন পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কেউ আর লিটল ম্যাগাজিনের দিকে ঝুঁকতে সাহস পান না। আবারও বলছি, নবীন লেখকদের জন্য লিটল ম্যাগাজিন একটি আদর্শস্থান। প্রতিভা বিকাশ ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য, অনুশীলনের জন্য লিটল ম্যাগের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। আজও যদি আমাদের এই প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত ধারাটি অব্যাহত রাখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের শিশু সাহিত্যসহ সার্বিক দিকে সমূহ সুফল বয়ে যাবে। এর জন্য প্রয়োজন কেবল তরুণদের উদ্যম,সাহস, কঠোর পরিশ্রম, সাধনা আর সমাজের অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের উদারতা। মূলত তারা হৃদয়টাকে একটু খুলে দিলেই আমাদের ঐতিহ্যবাহী এই ধারাটি আবারও

www.nagorikpathagar.org

সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। অগ্রজদের দায়িত্ব-কর্তব্য হলো অনুজদেরকে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করা। এই দায়িত্ববোধ যদি জাগিয়ে রাখা যায় তাহলে নতুন লিখিয়েদের জন্য নিঃসন্দেহে কল্যাণ বয়ে আনবে। আর তাতে করে মূলত লাভবান ও বেগবান হবে আমাদের সার্বিক সাহিত্যের ভুবনটি। আবারো জোর দিয়ে বলছি, সাহিত্যের জন্য, শিশু সাহিত্যের বিপুল বিকাশের জন্য লিটল ম্যাগাজিনের ভূমিকা ব্যাপক-বিশাল। এ ব্যাপারে তরুণদের যেমনি এগিয়ে আসা দরকার, তেমনি এগিয়ে আসা জরুরি সমাজের হৃদয়বান মানুষের। তাহলেই কাজটি সহজ হয়ে উঠবে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতায়।

শিশু সাহিত্য : সরকারি প্রকাশনার হালচাল

বাংলাদেশের শিশু সাহিত্য বিকাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটি কথা উদ্বেগের সাথে বলতে হয় যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের দেশে বাংলা একাডেমী, শিশু একাডেমী ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন—এই তিনটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু সাহিত্যের যে ধরনের বই প্রকাশ করলে আমাদের জাতি আরও বেশি উপকৃত হত, কার্যত তা হয়নি। আমাদের মনে হয় শিশু সাহিত্যের বই প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই সকল প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অভাব, আবিবেচনা এবং বিষয়ে দায়সারা মনোভাবই এর পেছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী।

কিছু বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক সফল উদ্যোগ

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই বাংলাদেশে কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে শিশুতোষ গ্রন্থ। এ সকল গ্রন্থের পেছনে যে সুনির্দিষ্ট চিন্তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কাজ করে তার প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রন্থগুলো দেখলেই।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। এটা কেবল কথার কথা নয়। আক্ষরিক অর্থে সত্য। সুতরাং সেই শিশু-কিশোরদের মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন সেই ধরনের বইপত্রের সাথে তাদেরকে নিবিড় করে তোলা। মূলত এ ধরনের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে, বাণিজ্যিক চিন্তাকে পরিহার করে কিছু প্রতিষ্ঠান দায়িত্বের সাথে এদিকে এগিয়ে এসেছে। তাদেরও রয়েছে বেশ কিছু সমৃদ্ধ প্রকাশনা। এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, শতাব্দী প্রকাশনী, আইসিএস প্রকাশনী, এডুকেশন সোসাইটি, কিশোর কণ্ঠ পাবলিকেশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রতিষ্ঠান থেকে শিশু-কিশোরদের জীবন গঠনমূলক বইপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেমন আল কুরআন, আল-হাদীস, নবী-রাসূলদের জীবনী, সাহাবীদের

www.nagorikpathagar.org

জীবনী, ইতিহাস-ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থ রয়েছে, তেমনি রয়েছে নীতি-নৈতিকতা ও জীবন গঠনমূলক নানা ধরনের গ্রন্থ। 'রাসূল [স]-এর জীবনী, ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষা ছাড়াও কিশোর আলোর পথের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে। আমাদের শিশু সাহিত্যের ভাণ্ডারটি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এই সকল প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পিত চেষ্টায়।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশনা ছাড়াও ব্যক্তি উদ্যোগে আমাদের দেশে এখন বহু প্রকাশনা প্রতিদিনই প্রকাশ করছে শিশুতোষ গ্রন্থ। বলা আবশ্যক, সেগুলোও আমাদের শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানস গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

আগেও বলেছি, শিশুদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত উদ্যোগের। তাদের চরিত্র ও জীবন-গঠনমূলক গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা যত বেশি প্রকাশ করা যাবে, এই সকল প্রকাশনার সাথে তাদের যত বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা যাবে, ততোই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আমাদের এই সকল শিশু-কিশোর। আর তারা উন্নত ও সফল হলেই কেবল 'জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হিসেবে পরিগণিত হবে। নচেৎ বিড়ম্বনার শেষ থাকবেনা।

আমরা আমাদের সাহিত্য ও সার্বিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জাতিকে সেই 'উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ' উপহার দেবার সংকল্পে সুদৃঢ় হতে পারি। সেটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আশার আলো

অনেকটা হাঁটি হাঁটি পা পা করে এখন দেখা যাচ্ছে আমাদের শিশুতোষ গ্রন্থের ভাণ্ডার ক্রমাগতপূর্ণ হয়ে উঠছে। যে অভাব বোধটা এতকাল ছিল, তার অনেকটাই পূর্ণ হতে চলেছে। ইতঃমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে আল কুরআনের গল্প, হাদিসের গল্প, সীরাত গ্রন্থ, সাহাবীদের জীবনী, নবীদের [আ] জীবনী, উপন্যাস, গল্প, ছড়া, ইতিহাস, মুসলিম মনীষীদের জীবনী, নাটক, প্রবন্ধ, গদ্য, ইসলামী গান প্রভৃতি গ্রন্থ। শিশু সাহিত্যে সর্বশেষ সংযোজন আমাদের অডিও এবং সিডি। সুতরাং এসব সময়োপযোগী সচেতন প্রয়াসে আমাদের শিশু সাহিত্য যে ক্রমশ পূর্ণতার দিকে ধাবিত হচ্ছে— এ ব্যাপারে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠতে পারি।

তবে স্বীকার করতেই হবে যে, প্রয়োজনের তুলনায় প্রাপ্তিটা এখনও নেহায়েত কম। সুতরাং আত্মতৃপ্তিতে বুঁদ হয়ে থাকার মত এখনও সময় আসেনি। প্রয়োজন পরিকল্পিতভাবে সামনে এগুনো। তাহলে আশা করা যায় আমরা এই দেশে আজ না হলেও কাল— আগামীতে এই আন্তরিক প্রচেষ্টার সুফল পেয়ে যাব।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যাশার বারিধারা

স্বাধীনতা-উত্তর শিশু সাহিত্যে আমরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, অদূরদর্শিতা এবং অপারঙ্গমতা আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল বেশ কিছুকাল।

আমরা বেদনার সাথে শিশু-কিশোরদের চরিত্র ও মানসগঠনমূলক বই-এর তীব্র অভাববোধ করেছি। ছড়া, কবিতা যদিও থেমে ছিল না, কিন্তু শিশু সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমগুলো বলতে গেলে থমকে গিয়েছিল। সেই পূর্ণতা দূর করার মানসে ক্রমান্বয়ে দায়িত্বের সাথে এগিয়ে এলেন একঝাঁক বিবেকবান প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। অপ-ইতিহাস ও অনাদর্শের কবল থেকে আমাদের কোমলমতি শিশু-কিশোরদের রক্ষায় দুর্বার গতিতে এগিয়ে এলেন অনেকেই। শিশুতোষ গল্প-উপন্যাসের চাহিদা মেটাতে এরপরই এলেন একঝাঁক টগবগে তরুণ। কালে কালে শিশুতোষ গদ্য, প্রবন্ধ, জীবনী, ইতিহাস সহ নানা শাখায় পল্লবিত হয়ে উঠলো আমাদের শিশু সাহিত্যের বাগানটি। এক সময় এর সাথে যুক্ত হলো অনুবাদও। আরবি, উর্দু, ফার্সি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ও লেখা অনুবাদের মাধ্যমে পৌঁছে গেল আমাদের শিশুদের হাতে। আনূদিত ও লেখা হলো শিশু-কিশোরদের উপযোগী কুরআন-হাদিসের গল্প কাহিনী, সাহাবীদের জীবনী, মুসলিম মনীষীদের জীবনী প্রভৃতি।

অভাব ছিল ইসলামী গান, নাটক, ইত্যাদির। এক সময় সেটাও পূরণ হলো। এখন তো ইসলামী গানের অডিও-ভিডিও ক্যাসেট, সিডি প্রভৃতির জোয়ার বয়ে চলেছে। মোট কথা, আমাদের শিশু সাহিত্যের সকল দিক ও বিভাগই এখন পূর্ণতার দিকে ধাবিত। ছড়া-কবিতা, গদ্য, জীবনী, ইতিহাস, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, সায়েন্স ফিকশন, এ্যাডভেঞ্চার সিরিজ, ইসলামী গান, নাটক, জ্ঞান-বিজ্ঞান, খেলাধূলা, তথ্য-প্রযুক্তিসহ পাঠ্যপুস্তক পর্যন্ত প্রায় সকল বিষয়ই আমাদের লেখকদের হাতে সাবলীল গতিতে উঠে আসছে। একটা কল্যাণকামী নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে এর পেছনে কাজ করছে, সেটা স্পষ্ট। এই ধারাটা অব্যাহত থাকলে আশা করা যায়, আমাদের শিশু সাহিত্যের যে অপূর্ণতাটুকু রয়ে গেছে, সেটা সহসাই কেটে উঠবে। আদর্শ ও কল্যাণকামী শিশু সাহিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠার বিষয়টি এখন মাত্র সময়ের ব্যাপার।

স্মরণ রাখা জরুরি যে, আমাদের শিশু সাহিত্যের এই পালাবদলটি শুরু হয়েছিল আশির দশকে। লক্ষ্যণীয় বিষয় বটে, মাত্র দুটি দশকে আমাদের সচেতন শ্রম ও

www.pathagar.com

নিষ্ঠায় বহুদূর এগুনো সম্ভব হয়েছে। আজ নতুন নতুন বহু, অসংখ্য প্রতিভাবান লেখক এই সত্যনিষ্ঠ সাহিত্যিক কাফেলার সহযাত্রী। সুতরাং হতাশা নয়, বরং আমরা আজ একটা আশার উপত্যকায় নিশ্চয়ই ঠেস দিয়ে কিছুটা প্রশান্তির প্রশ্বাস ফেলতে পারি। এই সকল সত্যনিষ্ঠ কাফেলার সামগ্রিক শ্রম, নিষ্ঠা, ত্যাগ ও ঘামঝরা প্রহর আগামীতে যে আমাদের শিশু সাহিত্যের আকাশে সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সূর্যের উদ্ভব ঘটাতে সক্ষম হবে, এই বৈপ্লবিক আভাসই এখন প্রতিফলিত হচ্ছে আমাদের আশাবাদী চোখে। আল্লাহর রহমত, বরকত এবং তাঁর একান্ত অনুগ্রহ আমাদের এবং এ দেশের শিশু-কিশোরদের জন্য শ্রাবণের বৃষ্টির মত ঝরুক, এটাই কামনা করছি। কামনা করছি আমাদের শিশু সাহিত্যের সকল অপূর্ণতা দূর হয়ে তা ভাস্বর হোক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে, সহস্রধারায় ভেসে চলুক সফল সাম্পাদন।

শেষ কথা

একটি ব্যাপারে আমরা প্রশ্নাতীত এবং সুদৃঢ় থাকতে চাই যে, আমাদের সমগ্র শিশু সাহিত্যকেই গড়ে তুলতে হবে সুনীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে। যা পাঠ করে আমাদের শিশু-কিশোররা তাদের জীবনকে সাজাতে পারে সবুজ স্বপ্নে, সত্য ও সততার রৌদ্রে তারা গোসল করতে পারে এবং দুনিয়া ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই সফল হতে পারে। তাদেরকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা, জাগিয়ে তোলা, স্বপ্ন দেখানো, পথের সন্ধান দেয়া এট শিশু সাহিত্যিকদের মুখ্য কাজ। দায়িত্ব এবং কর্তব্য বলেও মনে করি। এ ক্ষেত্রে কোনো রকমের সংশয় বা গোঁজামিলের আশ্রয় নিলে সেটা হবে আত্মহননেরই শামিল।

এজন্য আবারও বলবো, আমাদের শিশু সাহিত্যিকদেরকে হওয়া প্রয়োজন সৎ, সত্যনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং অসম্ভব সাহসী। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তাদের স্বচ্ছতা থাকতে হবে। কোনো প্রকার চিন্তা ও মননের দ্বন্দ্ব এখানে সমূহ বিপদ ডেকে আনতে পারে। আর সেক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বয়ে আনবে আমাদের শিশু সাহিত্যে। গোপাল ভাঁড়, হরেন, গগেন নয়—বরং আমাদের সন্তানদেরকে পরিচিত করে তুলতে হবে হাজী শরীয়তুল্লাহ, তিতুমীর, শাহজালাল, খান জাহান আলী, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মনিরুজ্জান ইসলামাবাদী, ইসমাঈল হোসেন সিরাজীসহ মুসলিম সাহসী মনীষীদের সাথে। তাদেরকে পরিচিত করাতে হবে আমাদের সৌর্য-বীর্যের আলোকিত ইতিহাসের সাথে।

www.pathagar.com

অতীতের সাথে বর্তমানের, গভীর জ্ঞানের সাথে বিজ্ঞানের, জাতির সাথে আন্তর্জাতিকতা, দেশের সাথে বহির্বিশ্বের পরিচয়ে ভাস্বর করে তুলতে হবে। এর জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর কথাটা আবারও জোরে-শোরে উচ্চারিত হতে বাধ্য। মনে রাখা প্রয়োজন, উদ্দেশ্যহীন কোনো কাজই সফলতা বয়ে আনে না। এ ব্যাপারে আমাদের লেখকদের আরও সচেতন, আরও বেশি আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। লেখার পূর্বেই আমাদের ভেবে নিতে হবে কি, লিখবো, কাদের জন্য লিখবো, কেন লিখবো। যদি এই তিনটি ব্যাপারে আমাদের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছভাবে কাজ করে, তাহলে আশা করা যায়, আমাদের শিশু সাহিত্যে যে অপূর্ণতাটুকু রয়ে গেছে, সেটুকুও আগামীতে পূর্ণতায় রূপলাভ করবে।

আমরা সেই চূড়ান্ত সফলতা এবং আমাদের শিশু সাহিত্যের সার্বিক বিজয়েরই প্রত্যাশা করছি।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org